দু'চোখে

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন ১৩৫৯ সন

প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদপট
শ্রী গণেশ বসু
হাওড়া-৪

মুদ্রক
ছবি বর্মণ
রমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১, কালিদাস সিংহ লেন,
কলকাতা-৯

উৎসর্গ

"রা-স্বা"

শ্রী দীপক রায়

করকমলেষু

১

মেয়েরা যখন রান্নাঘরে থাকে তখন পুরুষদের যে-কোনোও সময়েই বিপদ। রান্নাঘরটা স্বভাবতই একটু গরম জায়গা, একজস্ট ফ্যান লাগানো সত্ত্বেও গরম। রাগী মহিলাদের পক্ষে রান্নাঘর মোটেই সুবিধের জায়গা নয়। তার ওপর কাল জামাইষষ্ঠী। আজই বুলা তার বরকে নিয়ে রাতের গাড়িতে এসে হাজির হবে। অর্চনাকে সুতরাং বিশাল আয়োজন করতে হচ্ছে। একটা বাচ্চা চাকর এবং একজন চব্বিশ ঘণ্টার ঝি-কাম-রাঁধুনী থাকা সত্ত্বেও এই গরমে অর্চনাকে গোটা সন্ধেটাই পড়ে থাকতে হচ্ছে রান্নাঘরে। উনপঞ্চাশ বায়ু কুপিত হতে দোষ কী?

তার ওপর ঝুমা আজ গাছে জল দিতে ভুলে গেছে, সামনের ঘর ডাস্টিং করে নি, বাথরুমে যাওয়ার সময় ঘরের লাইট আর ফ্যানের সুইচ অফ করে নি, দুধ খায় নি, মার্কেটিং থেকে ফিরে এসে শাড়ি ভাঁজ করে রাখেনি এবং ইত্যাদি। আঠারো বছর বয়সের মেয়েরা যা যা ভুল করে থাকে আর কি। আঠেরো বছর বয়স ভয়ংকর সুকান্ত লিখে গেছে না। ওই বয়সের মেয়েদের মন কি ঘরমুখী থাকে কখনো? কত দিকে ছুট লাগায়, উধাও হয়ে যায়। কিন্তু ওই অত বড় মেয়ে যে মায়ের সাহায্যে আসে না, সারাদিন যে শুয়ে বসে বই পড়ে এবং টিভি দেখে সময় কাটায়, নিজের এঁটো চায়ের কাপটাও যে বেসিনে রেখে যেতে পারে না এসব সুবীরের চোখে ক্ষমার যোগ্য অপরাধ হলেও অর্চনার চোখে নয়।

আর ঝুমা অপরাধ করলে তার সিংহভাগ তার বাপ সুবীরের ওপরে কী করে যেন অর্শায়। আর ঠিক তখন ঝুমাকে উপলক্ষ করে সুবীরের ওপর

অর্চনার শব্দভেদী আক্রমণ ক্রমে ক্রমে ভয়ংকর হয়ে ওঠে। পঁচিশ বছরের বিবাহিত জীবনের নানা বঞ্চনার ইতিহাস শাখা প্রশাখায় বিস্তারিতভাবে প্রকাশ পেতে থাকে। এবং এমনই মারাত্মক সব বিশেষণ ও ব্যাখ্যা থাকে যা সুবীরের কোনোও সম্ভাব্য জীবনীকারই লিপিবদ্ধ করতে সাহস পাবে না।

অফিস থেকে ফিরে এই সময় সুবীর স্নান করে। নতুন বাড়ির নতুন বাথরুমে নতুন শাওয়ারের মুখ খুলে পিন-ফোটানো অজস্র জলবিন্দুতে সিক্ত হওয়ার যেমন আরাম আছে, তেমনি জলের শব্দে বাইরের আর সব শব্দ ডুবে যাচ্ছে সেটাও কম কথা নয়।

কিন্তু পুরোটাই যে ব্যর্থ হচ্ছে অর্চনার প্রয়াস তাও নয়। ভাষা বা অর্থ বোঝা না গেলেও অর্চনার কণ্ঠস্বরের উচ্চগ্রাম এবং উত্তাপ ফোয়ারার শব্দ ভেদ করে ঠিকই এসে বিদ্ধ করছিল সুবীরকে। চোখ বুজে, দাঁতে দাঁত চেপে বাহান্ন বছরের যুবা সুবীর ভাবছিল, অর্চনার বদলে নন্দিতা তার বউ হলে কি এর চেয়ে বেটার কিছু হতো? কথাটা সে প্রায়ই ভাবে এবং ভেবে পঁচিশ বছরেও প্রশ্নটার কোনোও সমাধানে আসতে পারে নি।

ঝুমা ঠিক এ সময়ে টি ভি খুলে বসে। রাত আটটায় কিছু একটা ভালো প্রোগ্রাম থাকবেই। কিন্তু আজ আর সাহস পায় নি। নিজের ঘরটিতে চুপ করে বই খুলে বসে আছে। পড়ছে না। ভাবছে। এ বাড়িটাকে তার কেমন যেন আজকাল আর আপন বলে মনে হয় না। বাবা মা কেউই যেন তেমন আপনার জন নয় তার। মা বকবে, সে তো ঠিক কথা। কিন্তু এত নিষ্ঠুরভাবে বকে, এত সব সাঙ্ঘাতিক কথা উচ্চারণ করে যে, ঝুমার বুকটা শুকিয়ে যায়। আজকাল তার কান্না পায় না ঠিকই, কিন্তু কেমন যেন একটা জেদ, একটা কঠিন মনোভাব তাকে ভিতরে ভিতরে মায়াহীন করে তোলে। আর বাবা যে তাকে অত ভালবাসত সেও কি আর তেমন আছে? কেমন যেন আনমনা, অন্যমনস্ক, নিজের চিন্তায় বিভোর। বাবা আর মায়ের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব সবসময়েই লেগে আছে। এক এক সময়ে

সেটা এত বিশ্রী চেহারা নেয়।

খাতা টেনে নিয়ে একটা সাদা পাতায় ঝুমা একটা সুইসাইড নোট লিখল। প্রায়ই লেখে। নতুন কিছু নয়। কী লিখবে, কিভাবে লিখবে তা বহুবার ভেবে দেখেছে সে। সে কি লিখবে "আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়," না কি "মা ও বাবার জন্যই আমাকে মরতে হলো," না কি "আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করছে না বলেই মৃত্যুকে ডেকে নিলাম," অথবা···

আজ ঝুমা সাদা পাতাটায় একটিমাত্র শব্দ লিখল, "যাই।" তারপর চেয়ে রইল শব্দটার দিকে। বাঃ বেশ তো। ছোট্ট কিন্তু গভীর। পুলিশ হয়তো খুশি হবে না। কিন্তু তাতে তার কী?

অবিনশ্বর অর্থাৎ অবুর জীবনে কোনও সমস্যাই নেই। আর এই যে সমস্যা-হীনতা এইটিই তার সমস্যা। বাবা সুবীর ও মা অর্চনার দুই মেয়ের মাঝ-খানে সে। বলাই বাহুল্য, একমাত্র ছেলে বলে তার আদর আর আসকারা একটু বেশীই হয়ে থাকবে। সুখাদ্যের শ্রেষ্ঠ অংশ, বেশী দামী জামাকাপড়, খেলনা, শখের জিনিস সে যত পেয়েছে তত আর কেউ নয়। বকা-ঝকা মারধর তার ভাগ্যেই সবচেয়ে কম জুটেছে। অত যে রাগী মা, যার ভয়ে সবাই তটস্থ, সেই মা অবধি তার সামনে এক্কেবারে জল।

সমস্যা অবুর জীবনে নেই ঠিকই, তবে নন কমিউনিকেশন আছে। সে তার বাবা সুবীরকে একদম পছন্দ করতে পারছে না। মাঝে মাঝে একটু ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ হচ্ছে আজকাল। তার বাবা সুবীরও যে তাকে একদম পছন্দ করে না এটা সে টের পায়। পছন্দ না করার কতগুলো কারণ আছে। এক হলো, অবু মুখের ওপর স্পষ্ট কথা বলতে দ্বিধা করে না। অবু তার বাবাকে দেবতা বলেও ভাবে না। সে এই সংসারে মায়ের চেয়ে বাবার গুরুত্বকে অধিক বলে স্বীকার করে না। বছরখানেক আগে সুবীর ও অর্চনার মধ্যে দৈনন্দিন ঝগড়ার এক কুৎসিত পরিণতিতে সুবীর একটা কাঁচের গ্লাস ছুঁড়ে মেরেছিল অর্চনাকে। অর্চনার হাত অনেকটা কেটে গিয়ে প্রচুর রক্তপাত হয়। অবু রাগ সামলাতে না পেরে তার বাবার হাত

মুচড়ে প্রায় ভেঙে ফেলেছিল। সুবীর সামান্য মাতাল অবস্থায় ছিল বলে প্রতিরোধ করতে পারে নি। কিন্তু হাত নিয়ে দুজনেই ভুগেছিল। সেই থেকেই কি ছেলের প্রতি সুবীরের রাগ? কিন্তু লোকটার ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, বাড়িতে আরও একজন মানুষ সাবালকত্বে পা দিয়েছে, সে আর খোকাটি নেই, শক্তসমর্থ একজন পুরুষ, এবং তার নিজস্ব রুচি, ইচ্ছে এবং অনিচ্ছে, তার নিজস্ব রাগ ও প্রতিহিংসা জন্ম নিয়েছে। সে উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী।

চাকরি পেলে অবু তার মাকে আলাদা করে নিজের কাছে নিয়ে রাখবে। মাকে যে সে ভীষণ ভালবাসে এমন নয়। কিন্তু এই মহিলার প্রতি তার কিছু পক্ষপাত আছে। তার জন্য মা যত করেছে, বাবা তত নয়।

অবু ছাত্র খারাপ নয়। মেক্যানিক্যাল ইনজিনিয়ারিং-এ সে প্রথম শ্রেণী পাবে, এটা ধরেই নেওয়া যায়। চাকরির অভাব তার হবে না। আর হলেই এই পরিবারের সঙ্গে তার কাট।

আজ অবু তার স্কুটারে রত্নাকে নিয়ে এসেছে। রত্না তার অনেক বান্ধবীদের একজন। একটু উচ্ছল, গায়ে-পড়া ঢলানী। রত্নাকে সে যে খুব পছন্দ করে তাও নয়। তবে একসঙ্গে অনেকদিন একই স্কুলে পড়েছিল, এই যা। এখন রত্না কলেজে সায়েন্স পড়ে। রত্নার সঙ্গে তার প্রেমটেম নেই, তবে একটা বিশ্বস্ততা আর নির্ভরতার সম্পর্ক আছে।

বান্ধবীদের বাড়িতে-আনা কোনো নতুন ব্যাপার নয় তার কাছে। এদের সকলের সঙ্গেই এ বাড়ির লোকদের চেনা জানা ও ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেছে।

স্কুটারটা শূন্য গ্যারাজে ভরে রোলিং শাটারটা টেনে নামিয়ে তালা লাগাল অবু।

রত্না বাইরে দাঁড়িয়ে বাড়িটা দেখছিল। সামনে আড়াই কাঠার মতো বাগান। এখনো গাছপালা তেমন ঘনবদ্ধ হয়ে ওঠে নি। বাড়িটারও সব কাজ শেষ হয়ে যায় নি এখনো। তবু ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে জ্যোৎস্নায়।

অবু একটু হেসে বলল, কেমন দেখছিস আমাদের তাজমহল?

ভালোই রে।

বাইরেটাই ভালো। ভিতরে কবরখানা।

তুই অবু, ভীষণ স্ক্যাণ্ডালমঙ্গার ! নিজের বাড়ি সম্পর্কে ওরকম কেউ বলে ?

আমার তো তোর ফ্যামিলিটাকে বেশ ভালোই লাগে।

তুই একটা গাধা। এই সব ধূর্ত মিডলক্লাসকে কি বাইরে থেকে বোঝা যায়। এরা সব মুখোশ পরা মানুষ।

সব বাড়িতেই একটু আধটু গণ্ডগোল থাকে। আমার বাড়িতেই কি কম ?

ঠিক আছে, ঠিক আছে বাবা, স্কিপাদা ফ্যামিলি বিট। ভিতরে চল আজ খুব খাওয়া-দাওয়া আছে। চোর জামাইটা আজ আসবে।

রত্না খিলখিল করে হেসে ফেলল, তুই না বাঙালদের মতো সরল। চোর কী রে ?

আমার ভগ্নীপতি তো চোরই। বড় কোম্পানিতে আছে সেলসে,। ট্যুরের নামে হাজার হাজার টাকা ফাঁক করছে, কমিশনে মারছে। ফাণ্ডা দেখলে চোখ ট্যারা হয়ে যাবে।

আয় না, বাগানে একটু বসি। ঘরে এই গরমে ঢুকতেই ইচ্ছে করছে না। স্কুটারে এতক্ষণ কী সুন্দর হাওয়া খেতে খেতে এলাম।

বসবি। দাঁড়া তবে চেয়ারের জোগাড় করি।

চেয়ার লাগবে না। ওই তো অনেক পাথরকুঁচি পড়ে আছে। ওখানে বসলেই হবে।

তুই বোস, আমি মাকে বলে আসি যে, আমরা বাগানে আছি।

যা।

দরজার বাইরে থেকেই অবু তার মায়ের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিল।

ডিসগাস্টিং।

কলিংবেল টিপতেই ঝুমা এসে দরজা খুলে দিলো। তার মুখে আষাঢ়ের মেঘ।

আজ আবার কী হয়েছে রে ?

ঝুমা মুখটা বিকৃতি করে বলল, কী আর হবে ? রোজ যা হয়।

জুতো পায়েই অবু সোজা একেবারে রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। মাথাটা গরম।

প্রায় ধমকের স্বরে বলল, মা ?

অর্চনা একসময়ে যথেষ্ট সুন্দরী ছিল। আজও আছে। তার মুখশ্রীতে মন্দির ভাস্কর্যের একটু ছায়াপাত ঘটেছে। রং ভীষণ রকমের ফর্সা। শরীরের বাঁধুনি প্রায় কিশোরীদের মতো। অর্চনা খুব লম্বা চওড়া নয়, বরং একটু ছোটো-খাটো, পুতুল-টুতুল।

ছেলের ধমকে ম্যাজিকের মতো কাজ হলো। অর্চনা মিইয়ে গিয়ে আঁচলে মুখ মুছে বলল, এই আসবার সময় হলো তোর ?

কণ্ঠে প্রগাঢ় প্রশ্রয় ও অভিমান।

অবু কড়া গলাতেই বলল, তোমাকে না বারণ করেছি, চেঁচামেচি করবে না। ফের করছিলে ?

অর্চনা এই একজন মানুষকেই ভয় খায়। বলল, কখন আমাকে চেঁচাতে শুনলি তুই। কথা বললেই বুঝি চেঁচানো হয় ? যা তো, হাত মুখ ধুয়ে একটু মুর্গী খা। তন্দুরে করেছি।

এ বাড়িতে আরওএকজন আছে। সে বৃদ্ধ এবং নির্বিকার। সে হলো আইক। একটা দোআঁশলা টেরিয়ার। আজকাল তার তেজবীর্য নেই, চেঁচামেচিও বিশেষ করে না। সারাদিন ঝিম মেরে কাটিয়ে দেয়। তবে মাঝে মাঝে অত্যন্ত উদাসীন দার্শনিক ডাক ছাড়ে সে।

অসমাপ্ত সিঁড়ির চাতাল থেকে ধীর পায়ে নেমে এলো আইক। এসে অবুকে একটু শুঁকল, পায়ের উপর একটু মাথা ঘষে আদর জানালো। তারপর আর একটা উদাসীন আওয়াজ করে নির্দ্বিধায় চলে গেল ঝুমার টেবিলের তলায়।

অবু বলল, রত্না এসেছে, বাগানে বসছি একটু। খাবার টাবার ওখানেই পাঠিয়ে দিও।

রত্না যাওয়ার আগে যেন দেখা করে যায়। বলিস।

ঠিক আছে।

বাইরে যাওয়ার মুখে অবু বোনের ঘরে একটু উঁকি দিলো। বেশ সাজিয়েছে ঘরটা। খুব দামী একটা স্টিরিও আছে ঝুমার। আর আছে গান-বাজনার সরঞ্জাম। একটা দেয়াল জোড়া ঝকঝকে কাচের শো-কেসে সব সাজানো। বুক কেস, পড়ার টেবিল থেকে ডিভান সবই বেশ পরিপাটি। নিজের ঘরখানা ঝুমা তকতকে রাখার চেষ্টা করে।

আজ টিভিতে এখন কী আছে রে? ভালো কিছু?

সিরিয়াল ছিল একটা। দেখছি না।

পড়ছিস না কি? না অভিনয়?

ঝুমা জবাব দিলো না।

অবু তার বোনটিকে মোটামুটি পছন্দ করে। একসময়ে দাদা ছিল তার আইডল। এখন আর নেই। তবু দাদাকে বোধহয় ঝুমা তেমন অপছন্দ করে না। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দূরত্ব বাড়ছে। দুস্তর ব্যবধান গড়ে উঠছে। দিদির সঙ্গে যেমন হয়েছে আজকাল।

বাইরে যাওয়ার মুখে বাপ সুবীরের সঙ্গে একবার চোখাচোখি হলো অবুর। সুবীর বাথরুম থেকে বেরুচ্ছে। সিক্ত, স্নিগ্ধ শরীর। ভুর ভুর করছে চন্দন সাবানের গন্ধ।

আজকাল বাপ ব্যাটায় বিশেষ কথাবার্তা হয় না। পরস্পরকে এড়িয়ে চলে। এমন কি খাবার টেবিলেও অবু বাবার সঙ্গে একসঙ্গে খেতে বসে না।

মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে অবু দরজা খুলে বেরিয়ে এলো।

২

সুবীর আজকাল বাড়িতে স্লিপিং স্যুট পরে থাকে। স্ট্যাটাস বেড়েছে। গোটা দুই ড্রেসিং গাউনও কেনা আছে। এখনো পরে উঠতে পারে নি। স্নানের পর শরীরে একটু পাউডার ছড়িয়ে নিল সুবীর। আজ আর ঊর্ধ্বাঙ্গের জামাটা পরল না। ফ্রিজ খুলে হুইস্কি আর জলের বোতল বের করে নিল। টেবিল থেকে তুলে নিল একটা গেলাস। সিগারেট ছাড়তে হয়েছে। কিন্তু ড্রিংকস চালিয়ে যেতে ডাক্তার বাধা দেয় নি।

ছাদে ইজিচেয়ার পাতাই থাকে। পাশে ছোটো একটা টুল। বোতল আর গেলাস তার ওপর রেখে জ্যোৎস্নায় একটু ঝুঁকে বাগানে ছেলে আর ছেলের বান্ধবীকে ঘনিষ্ঠভাবে বসে থাকতে দেখল সুবীর।

তারপর ইজিচেয়ারে বসে আকাশের দিকে চেয়ে খানিকক্ষণ চাঁদ দেখল। একটা বড় হুইস্কি ঢেলে নিয়ে জল মিশিয়ে যখন আস্তে প্রথম চুমুকটা দিলো তখন আপনা থেকেই একটা আরামের শ্বাস বেরিয়ে এলো বুক থেকে। একেই কি সফলতা বলে ?

সুবীর প্রায়ই এই ছাদে বসে রাত্রিবেলা নিজের ওপর একটা সমীক্ষা চালায়। নিজেকে যে সবটুকু সে বুঝতে পারে তা নয়। তবে জাগতিক সাফল্যগুলিকে দিয়ে নিজের কৃতিত্বকে যাচাই করে নেওয়ার চেষ্টা করে সে। কতখানি উপরে উঠেছে সে, আরও কতদূর ওঠা যাবে, এবং এই ওপরে ওঠা কোথায় গিয়ে শেষ হবে।

এই পোড়া-দেশে জন্মেও সুবীরকে জীবন-যুদ্ধ তেমন করতে হয় নি। যে কোনো মানুষের জীবনেই মাঝে মাঝে লীন পিরিয়ড আসে। তার জীবনেও

এসেছে বটে, কিন্তু সেটা দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম নয়, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে হাবুডুবু খাওয়াও নয়। একটু আধটু ওঠাপড়া মাত্র।

সুবীর অতীতচারণ করতে ভালবাসে না, ভবিষ্যতের ভাবনাও তাকে বিশেষ উদ্বিগ্ন করে না। এসব প্রবণতা মানুষকে ধীর করে দেয়। সে এটাও জানে যে, এক ছাদের নিচে বসবাস করলে, বিয়ে করলে বা সন্তানের জন্ম দিলেই যে আপনজন সৃষ্টি করা যাবে তা নয়। সুবীরের সেই অর্থে কোনো আপনজন নেই। বরং এরা, এই বউ ছেলে মেয়ে এরা সকলেই এক এক অর্থে তার প্রতিদ্বন্দ্বী।

সুবীর তার হুইস্কিতে চুমুক দিলো। ধীরে ধীরে পানীয় তার দখল নেবে এবং পৃথিবীটা সামান্য ভিন্নরকম লাগবে, খুব সামান্যই।

সুবীর আগে অবুকে নিয়ে ভাবত না। আজকাল ভাবে। অবু আজকাল যথেষ্ট জোরালো এক পুরুষ হয়ে উঠেছে। স্বাধীন, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, একটু অবিনয়ী।

সুবীর নিজেও কোনোদিন বিনয়ী ছিল না। এখনো কাটা কাটা কথা, ঝাঁঝালো মেজাজ এবং মানুষকে একটু হীন দৃষ্টিতে দেখাই তার স্বভাবগত। অবু উত্তরাধিকার সূত্রে সেটা পেয়ে থাকতে পারে। আবার পৃথক অর্জনও হতে পারে।

একটু ঝুঁকে বাগানে অবু আর রত্নাকে দেখল সুবীর। ঘন হয়ে বসে আছে। পিছন থেকে ঠিক দেখা যাচ্ছে না, হয়তো বা একজনের কোলে অন্যজনের হাত। সুবীরের যৌবনে এতটা ঘনিষ্ঠতার মানেই হতো প্রেম। কিন্তু এখন ওই অতটা কাছাকাছি হওয়া সত্ত্বেও প্রেম নয়, নিছকই বন্ধুত্ব।

জ্যোৎস্না জিনিসটা একটা ক্যাটালিকটিক এজেন্ট। চারদিকটাকে কেমন পাল্টে একটা স্বপ্নের সর ফেলে দেয়। হুইস্কিও তাই! জ্যোৎস্না আর হুইস্কি এমন ককটেল কি আর হতে পারে?

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। সুবীরের ঘাড় ঘোরাতে ইচ্ছে করল না।

বাবু।

হুঁ।

মা সসেজ পাঠালেন।

সুবীর একটু অবাক হয়ে সুবালার দিকে তাকাল।

সে কী রে? হঠাৎ সসেজ কেন?

খান না। ফিশ ফিঙ্গারও দিয়েছেন সঙ্গে।

প্লেটটা টুলের ওপর রাখল সুবালা।

সুবীরের কোনো খিদে নেই। আজকাল খিদে বড় একটা হতে চায় না। শরীরের নাড়াচাড়া প্রায় নেই বললেই হয়। অনিচ্ছের সঙ্গে একটা সসেজ তুলে নিয়ে সুবীর মুখে পুরল। আজকাল বাঙালীর বাড়িতে আকছার এসব হয়।

সুবালা চলে যাচ্ছিল।

সুবীর ডাকল, সুবালা শোন।

বাবু?

কতদিন এ বাড়িতে আছিস?

তিন মাস হয়ে গেল।

দেশে যেতে ইচ্ছে করে না?

করবে না?

তবে যাস না কেন?

গিয়ে খাবো কী?

কেন, তোদের জমিজিরেত নেই?

ছিল তো। মানুষটা সব বেচে খেয়েছে।

বেচল কেন?

আপনার মতোই ছাইপাঁশ খায় যে। তার ওপর জুয়ো।

সুবীর মাথা নাড়ল। তারপর বলল, যা।

সুবালার সঙ্গে এই সংলাপের কোনো মানে হয় না। কিন্তু এ বাড়িতে আর কারও সঙ্গে এত সহজে সংলাপ রচনা করার সাধ্য সুবীরের নেই।

এই আপাত শান্ত ও ভদ্র বাড়ির ভিতরে যারা বাস করে তারা রক্তের সূত্রে আত্মীয় মাত্র। কিন্তু কারও সঙ্গেই কারও যোগাযোগ নেই।

হুইস্কি আর জ্যোৎস্নায় একটু ঢুলু ঢুলু ভাব এসে গিয়েছিল সুবীরের। কখন তন্দ্রা এসেছিল কে বলবে। চটকা ভাঙল গেলাস পড়ে ভাঙবার শব্দে।

সুবীর দেখল, বেড়ালটা টুলের ওপর। প্লেটে মুখ।

বোতলটা ভাগ্যিস মেঝেয় নামিয়ে রেখে গেছে সুবালা। নইলে ওটাও ভাঙত।

সুবীর তাড়া দিলো না। খাচ্ছে খাক। তার তো আর খিদে নেই। তবু ওর আছে।

সেই ব্যথাটা আজও আছে, সেই যে অবু-অর্থাৎ তার ছেলে অবিনশ্বর তার ডান হাতটা মুচড়ে দিয়েছিল। অবু কি ক্যারাটে জানে? জানতে পারে। বাইশ বছর বয়সের ছেলের কতটুকু খবর আর রাখে সুবীর?

বয়সের ব্যথা, সহজে সারবে না। হাতটা অবু ভেঙেই দিতে চেয়েছিল। স্পষ্টই ওর চোখে জিঘাংসা দেখতে পেয়েছিল সুবীর। সে চেঁচায় নি। জৈব আত্মরক্ষার তাগিদে, রাগে, বাঁ হাতে ঘুষি মারতে চেষ্টা করেছিল। পারে নি। ধ্বস্তাধ্বস্তিতে গোটা সাজানো ডিনারসেট সমেত উল্টে পড়ে গেল টেবিল, চেয়ার। কী সাঙ্ঘাতিক শব্দ হয়েছিল, ঝনঝন ঠনঠন। কাঁচ, চিনেমাটি ভেঙে খান-খান হলো। মেঝেয় গড়াল ভাত, মুর্গী, ডাল, পুডিং, আর তার মধ্যেই এ বাড়ির দুই প্রজন্মের দু'জন পুরুষ একে অন্যকে স্থায়িভাবে নুলো করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল।

সুবীর পারবে কেন? তার বয়স পঞ্চাশের ওপর। আর অবুর হাতে সাঙ্ঘাতিক জোর। মুর্গীর ঝোলে পিছলে পড়ে গেল সুবীর। হাতটা তখনও অবুর বাঘা থাবায় ধরা। চূড়ান্ত বেকায়দা অবস্থা। সেই সময় অবু মোচড়ের চাপটা আর একটু বাড়ালেই মট করে ভেঙে যেত কব্জী।

কে জানে কেন, অর্চনা চেঁচিয়ে উঠেছিল, অবু, ছেড়ে দে। যথেষ্ট হয়েছে। অবু ছাড়ল। ঝোল ডাল ভাঙা কাঁচের মধ্যে মধ্যবয়সী সুবীর অসহায়ের

মতো শুয়ে রইল কিছুক্ষণ। পেটে সেদিনও হুইস্কি ছিল। চোখে একটা হলুদ রঙ দেখতে পাচ্ছিল সে। আর বমি আসছিল। ডান হাতটা অবশ হয়ে নেতিয়ে পড়ে ছিল। লম্বা একটা সাপের মতো। যেন হাতটা তার নয়।

নেশা কেটে গিয়েছিল সেই সময়ে। ব্যথায়, অপমানে। তার চেয়েও বড় কথা, সত্য উদ্‌ঘাটনে। এইভাবে যে, এক একটা ঘটনার ভিতর দিয়ে জীবন তার সত্যকে উন্মোচিত করে দেখায় তা তো জানত না সুবীর।

কেউ সাহায্য করে নি, সুবীর নিজেই উঠে বসেছিল খুব ধীরে ধীরে। বুকের মধ্যে হাঁফ ধরে গেছে। মাথা টালমাটাল। চোখে ধোঁয়া-ধোঁয়া দেখছে। সেই কুয়াশার মধ্যেই আপনজনদের দেখতে পেল। অর্চনা, তার বউ। অবু, তার ছেলে। ঝুমা, তার মেয়ে। সুবীরকে তারা একটু দূরত্ব থেকে দেখছে। দেখছে, ডাল আর ঝোলমাখা একটি কমিক চরিত্রের মতো বসে আছে সুবীর। ঘরের মেঝের ওপর। ডান হাতটা কিছুতেই তুলতে পারছিল না সে। টেরই পাচ্ছিল না হাতটাকে। তবু চেয়ে রইল কিছুক্ষণ হাতটার দিকে।

ঘটনার সাক্ষী ছিল দু'জন ঝি-ও। তাদের পরে তাড়িয়ে দিয়েছে অর্চনা। তাদেরই একজন বুলি। গাঁয়ের মেয়ে, একটু বোকা-সোকা সরল ধরনের। সুবীরের বগলের নিচে হাত ঢুকিয়ে সে-ই টেনে তুলেছিল সুবীরকে।

টলতে টলতে বাথরুমে গেল সুবীর। অনেকক্ষণ বাথরুমের মেঝেয় স্তব্ধ হয়ে বসে থেকেছিল সে। বাইরে তখন অর্চনা আর অবু ক্রুদ্ধ স্বরে এক-যোগে তার উদ্দেশ্যে যা বলে যাচ্ছিল সেগুলো যত নগ্ন অপমানই হোক, আর গায়ে লাগছিল না সুবীরের।

তখন শীত ছিল, মনে আছে সুবীরের। ভেজা মেঝের শীতলতায় কেঁপে কেঁপে উঠছিল সে।

বাথরুমের দরজায় টোকা দিয়ে বুলি বলল, বাবু, বরফ বের করছি। হাতে লাগাবে না?

সুবীর জবাব দিতে পারে নি। অত অপমানেও নয়, কিন্তু বুলির এই কথায় তার চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে।

সেই কান্না অভিমান থেকে নয়, সাময়িক ভুল বোঝাবুঝি থেকে নয়, সেই কান্না সর্বস্ব-হারানো এক পুরুষের, যে সদ্য উপলব্ধি করেছে যে, তার আর কেউ নেই। ডান হাতের প্রচণ্ড ব্যথা সেই তুলনায় কিছুই নয়।

পায়জামা ছেড়ে কোমরে তোয়ালে জড়ানোরও সাধ্য ছিল না সুবীরের। ডান হাতটা তখন বিবশ। সেই চেষ্টাও করল না সুবীর। ভেজা পায়জামা, নোংরা জামা যেমন ছিল তেমনি অবস্থায় সে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো। তারপর সোজা উঠে গেল ছাদে।

ইজিচেয়ার পাতাই ছিল। ওই শীতে খোলা ছাদের ওপর বসে এক অর্ধ-চেতনায় সে তার ভাঙচুরগুলো হিসেব করার চেষ্টা করেছিল। সল্টলেক-এর বিখ্যাত লক্ষ লক্ষ মশা এসে ছেঁকে ধরেছিল তাকে। গ্রাহ্যও করেনি। শুধু চিনেমাটি আর কাঁচই তো নয়, আরও কত কী ভেঙে পড়েছিল সেদিন। জীবনের সবটুকু নির্মাণ ধূলিস্যাৎ।

ওই বুলিই এসেছিল ছাদে তাকে ডেকে নামিয়ে নিতে।

সুবীর শুধু মড়ার মতো পড়ে ছিল ইজিচেয়ারে। পৃথিবীর কিছুই তাকে স্পর্শ করছিল না। মাঝে মাঝে অবুর হুংকার কানে আসছিল, ওই ব্যস্টার্ড যদি আর কোনোদিন তোমার গায়ে হাত তোলে মা, তাহলে ওকে লাথি মেরে বের করে দেবো। যাক, যেখানে খুশি চলে যাক।

এই বাড়িটা করতে লাখ দুয়েক টাকা বেরিয়ে গেছে সুবীরের। চড়া সুদের ধার আছে, প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা আছে, ব্যাঙ্ক থেকেও কিছু নিতে হয়েছে। অর্চনার নামে বাড়ি। অর্চনাও কিছু দিয়েছে, যতটা তার চাকরির সুবাদে দেওয়া সম্ভব। হয়তো অর্চনা আরও কিছু দিতে পারত। দেয় নি। তার দেওয়া মাত্র সাত হাজার টাকায় বাড়ির কাঠের কাজগুলোও সম্পূর্ণ হয় নি। তবু অর্চনা দিয়েছে, এটা সুবীরকে স্বীকার করতেই হয়। বাড়ি

হয়ে যাওয়ার পর অর্চনা চাপ দিতে লাগল, পুরানো আসবাব বেচে দিয়ে নতুন সব ফ্যার্নিচার কিনতে হবে, নতুন পর্দা, নতুন সব আধুনিক ফিটিংস। এ ব্যাপারে মায়ের সঙ্গে ছেলে আর মেয়েও এক জোট হয়েছিল। অগত্যা ফের টাকার জন্যে সুবীরকে ছোটাছুটি করতে হয়েছে।

ভারী সুন্দর বাড়ি। অভ্যন্তরের শোভাও মুগ্ধকারী। যে দেখে সে-ই বাহবা দিয়ে যায়।

সুবীর কিন্তু সেই রাতে নিজের বাড়ির ছাদে হাতের যন্ত্রণায় অস্ফুট জান্তব শব্দ করতে করতে বাড়িটার ধ্বংসস্তূপ প্রত্যক্ষ করছিল। এক লহমায় সংসারের অসারতা প্রকট হয়ে গেল চোখের সামনে।

বুলি এসে বলল, বাবু, ঘরে চলুন। মা কাঁদছে।

তুই যা বুলি। আমাকে বিরক্ত করিস না।

তোমাদের যে কেন এত অশান্তি বাবু, রোজ ঝগড়া। ঝগড়া আমাদের বাড়িতেও হয়, কিন্তু আমরা তো ছোটোলোক। তোমাদের কেন হবে?

সুবীর এ কথার কী জবাব দেবে?

৩

সুমন্ত্র হাওড়ায় নামল বিরস মুখে। এক কোলে ছেলে, অন্য হাতে মাঝারি একটা স্যুটকেস। পিছনে ভ্রূকুটি-কুটিল মুখে বুলা। তার হাতে মস্ত বাস্কেট। তাতে বাচ্চার দুধের কৌটো, বোতল, তোয়ালে ইত্যাদি। এ সি চেয়ারকার থেকে দুর্দান্ত গরমের কলকাতায় পা দেওয়া হয়তো একটা বিয়োগান্ত ঘটনা। কিন্তু তার চেয়েও বিয়োগান্ত সুমন্ত্রর অ্যাটাচিকেসটা হাপিস হয়ে যাওয়া! শ্বশুরের কাছ থেকে ধার করে ফেরার টিকিট কাটতে হবে। কী লজ্জা!

এই, তুমি জি আর পি-তে চলো।

লাভ হবে কিছু? রাত বাড়বে। ট্যাক্সিওয়ালা সল্ট লেক-এ যেতে চাইবে না!

বেশি পয়সা দিলে ঠিক যাবে। জি আর পি-তে রিপোর্ট করলে অনেক সময়ে পাওয়া যায়।

সুমন্ত্র যথা নিয়মেই বউকে ভয় পায়। বলল, চলো, কিন্তু বাবাইটার খিদে পেয়েছে।

সহ্য করতে হবে। আমার মুক্তোর দুল'জোড়া যে কেন তোমাকে রাখতে দিলাম। ছিঃ।

দোষটা কি শুধু আমার?

তোমার দোষ তো বলিনি। তবে র‍্যাকে অ্যাটাচিকেস রাখা তোমার ঠিক হয় নি। অতগুলো টাকা ছিল, দামী পেন, ক্যামেরা, আমার দুল, দরকারী কাগজপত্র। তোমার উচিত ছিল অ্যাটাচিটা সিটের মধ্যেই গুঁজে রাখা।

পাগল ! খোঁচা লাগবে না ?

লাগতই না হয় একটু। চুরি তো যেত না।

এ সি চেয়ারকার থেকে চুরি যাবে কে ভেবেছিল বলো।

আজকাল লোকের হাতে অনেক টাকা। হেঁজি-পেঁজিরাও এ সি-তে ওঠে। সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

হাওড়া স্টেশনে জি আর পি-টা কোথায় তা জানা ছিল না সুমন্ত্রর। খুঁজে বের করতে অনেকটা সময় লাগল। ততক্ষণে স্যুটকেসের ভারে হাত ব্যথা করছে। ছেলের ভারে বাঁ অঙ্গ অবশ।

বুলা, বাবাইকে একটু নিতে পারবে ?

দাও। কিন্তু ও কি আমার কাছে থাকতে চাইবে ? যা বাপ-ভক্ত।

কথাটা মিথ্যা নয়। ছেলেটা অসম্ভব বাপ-ন্যাওটা। দেড় বছর বয়সে সে একটা মাত্র আপনজনকে চিনেছে। সে হলো সুমন্ত্র। বাপ যতক্ষণ অফিস করে ততক্ষণ বুলার নাভিশ্বাস।

বুলা বাবাইকে কোলে নিয়ে বলল, কল্পনাকে আনলে হতো। এ সময়ে কাজে লাগত। বাবাই তবু ওর কোলে থাকে।

তুমিই তো আনতে দিলে না।

একগুচ্ছের টাকা খরচ হতো। এখানে তো বাবাইকে নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। মা মাসী মামা দাদুর কোলে কোলে থাকবে। আমার বাপের বাড়িতে দুটো কাজের লোক। আর একটা বাড়তি লোক চাপানো ঠিক হতো না।

জি আর পি-তে বেশ ভীড়। প্রতি মুহূর্তেই নানা অভিযোগ দায়ের হচ্ছে। বড্ড গণ্ডগোল।

বুলা, হয়ে গেল।

কী হলো ?

ডায়েরী লেখাতে গেলে মধ্যরাত্রি হয়ে যাবে।

দাঁড়াও। আমি একটু দেখি। মেয়ে হওয়ার খানিকটা অ্যাডভান্টেজ তো

আছেই।

সুন্দরী হওয়ারও।

বুলা এক আধজনকে মধুর ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে টেবিলের কাছে পৌঁছে গেল এবং দশ মিনিটের মধ্যে অফিসারকে কব্জা করে ফেলল।

কী ধরনের অ্যাটাচিকেস বলুন তো! কালার?

বুলা মুখ ফিরিয়ে সুমন্ত্রকে বলল, এই এসো না এগিয়ে।

সুমন্ত্র চোরের মতো মুখ করে এগিয়ে গেল।

অ্যাটাচির রঙ? চারকোল ব্ল্যাক। ভিতরে ছিল বাইশশো টাকা, একটা মামিয়া ক্যামেরা, পার্কার ডট পেন, একজোড়া মুক্তোর দুল, কাগজপত্র।

অফিসার সব লিখে নিচ্ছিল।

পাওয়া যাবে?

যেতে পারে। লোকাল অ্যাড্রেস দিয়ে যান। খবর পেলে জানিয়ে দেবো। টেলিফোন থাকলে নম্বরটাও লিখে দেবেন। কোথায় চুরি গেল একটু আন্দাজ দিতে পারবেন?

সুমন্ত্র একটু ভাবল। তারপর বলল, দুর্গাপুরে আমরা চা খেয়েছিলাম। তারপর একটু জাস্ট তন্দ্রামতো···

বুঝেছি। কোথায় এসে দেখলেন যে, অ্যাটাচিটা নেই?

দেখি নি। আসলে আমাদের বাচ্চাটা একটু জ্বালাতন করছিল। আমরা ওকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। হাওড়ায় নামবার একটু আগে হঠাৎ খেয়াল হলো···

বুঝেছি।

বুঝে দেখুন, এ সি চেয়ার কার-এও আমাদের নিরাপত্তা নেই।

কোথাও নেই স্যার। আজকাল দারোগার বাড়িতেও চুরি হয়।

কোনও আশা আছে?

থাকবে না কেন?

খোঁজ নেবো কি?

নিতে পারেন। আমাদের পরিশ্রম বাঁচে। সই করুন।

বুলা বাচ্চাকে ফিরিয়ে দিলো সুমন্ত্রর কাছে, নাও তো। বড্ড জ্বালাচ্ছে।

সুমন্ত্র বাচ্চা আর স্যুটকেস, বুলা বাস্কেট হাতে গেট দিয়ে বেরিয়ে এলো।

ক'টা বাজে দেখ তো!

দশটা বেজে গেছে।

ইস!

ট্যাক্সি পেতে ঝামেলা হবে। তার চেয়েও বড় কথা, তুমি সল্টলেক-এর বাড়ি চিনবে কি না। একবার তো মোটে এসেছিলে।

ঠিকানা তো আছে। দেখা যাক।

ট্যাক্সির জন্য এই রাতেও বেশ লাইন। তার চেয়েও বড় কথা, বে-লাইনে বিস্তর ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। ডাকাডাকি করছে।

বুলা সাবধান করে দিলো, এই, লাইনের বাইরে ট্যাক্সি ধোরো না। ওরা ভালো নয়।

ডাকাতি করবে নাকি!

করতে পারে। চলো লাইনে দাঁড়াই।

অগত্যা সুমন্ত্রকে লাইনে দাঁড়াতে হলো। বেশ বড় লাইন। গোটা দুয়েক দূর-পাল্লার ট্রেন প্রায় একই সঙ্গে এসে পৌঁছেছে, ফলে এত রাতেও ভীড়।

পৃথিবীতে বেঁচে থাকা মানেই ঝঞ্ঝাট আর ঝঞ্ঝাট। একটা ঝামেলা মিটতে না মিটতে আর একটা এসে হাজির হয়। বিশেষ করে বিয়ের পর থেকে সুমন্ত্রর জীবনটা এই সব ঝঞ্ঝাটে এত কণ্টকাকীর্ণ হয়ে গেল যে বেঁচে থাকাটাই তার কাছে একটা কাঁটার বিছানায় শুয়ে থাকার মতো। বাজার করো, এটা আনো, সেটা করো। বাচ্চা হলো তো ঝঞ্ঝাট দ্বিগুণ হলো। রাতে পেচ্ছাপ করে, কাঁদে, কখনো পেট ব্যথা করে, খাট থেকে পড়ে যায়। এই তো সেদিন মধ্যরাতে ছেলে পেটের ব্যথায় নীলবর্ণ ধারণ করেছিল। বুলা তাকে প্রায় ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ঘরের বার করে বলল, যেখান থেকে পারো ডাক্তার ধরে আনো।

মধ্যরাতে ডাক্তার খুঁজতে বেরোনো যে কী সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। আসান-সোলের যে যে অঞ্চলে তারা থাকে তা মোটেই সুবিধের জায়গা নয়। চুরি ছিনতাই খুন জখম লেগেই আছে। তার মধ্যেই প্রাণ হাতে করে বেরোতে হলো। তার গাড়ি গেছে সারাই হতে। রিকশা নেই, ট্যাক্সি নেই, আধমাইল দূরে এক আধচেনা ডাক্তারকে বিস্তর মেহনতে জাগানো গেল বটে, কিন্তু সে পায়ে হেঁটে এত দূরে আসতে নারাজ। তবে দয়া করে লক্ষণ শুনে ওষুধ লিখে দিলো এবং ভিজিট চেয়ে নিলো। প্রেসক্রিপশন নিয়ে সুমন্ত্র বোকার মতো পথে নেমে পড়ল বটে, কিন্তু ওষুধ পাবে কোথায় ? সব দোকান বন্ধ। আবার ফিরে গিয়ে ডাক্তারকে জাগাতে হলো। ডাক্তার ফের দয়া করে তাঁর স্যাম্পেল ওষুধের কয়েকটা দিয়ে দিলেন।

ততক্ষণে বুলা আশেপাশের বাড়ির লোকজনকে জাগিয়ে ফেলেছে। তারা এসে ঘর ভরে ফেলল। মা মাসী গোছের যারা ছিল তারা চূনের জল এবং আরো কী কী সব টোটকা খাইয়ে ছেলেকে সুস্থ করে ফেলেছে। সুমন্ত্র যখন ঝোড়ো কাকের মতো চেহারা নিয়ে চোর-চোর মুখে ফিরল তখন ছেলে এক পাড়াতুতো দিদিমার কোলে গ্যাট হয়ে বসে খেলছে।

তা এই হলো, সুমন্ত্রর জীবন। সর্বক্ষণ কাঁটা হয়ে থাকা। সর্বক্ষণ সুতোর ওপর হাঁটা। কখন ঝঞ্ঝাট এসে হাজির হয়।

সুমন্ত্র গুনে দেখেছে, সামনে বত্রিশ জন। বত্রিশটা ট্যাক্সি এত রাতে হাওড়া স্টেশনে বাপের সুপুত্র হয়ে আসবে এমনটা আশা করা আর পক্ষিরাজ ঘোড়ায় বিশ্বাস করা একই ব্যাপার। তার কোলে ছেলে, কাঁধে মাথা রেখে গঙ্গার ফুরফুরে হাওয়ায় আরামে ঘুমোচ্ছে। স্যুটকেস পাহারা দিচ্ছে বুলা, সুমন্ত্র পৃথিবীর জটিলতার কথা ভাবতে ভাবতে অতিশয় উদ্বেগ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জামাইষষ্ঠী ! জামাইষষ্ঠী ব্যাপারটা এখনো কেন তুলে দেয় নি লোকেরা ?

আর সল্ট লেক ! সেও এক রাক্ষসের পুরী বলে শুনেছে সুমন্ত্র। খাঁ খাঁ রাস্তাঘাট, সুনসান সব বড় বড় ফাঁকা জায়গা। ট্যাক্সি যেতে চায় না,

বাস-টাস বিশেষ নেই। সন্ধ্যা রাত্রে সেখানে নিশুতি নেমে আসে।

এই, শোনো।

সুমন্ত্র একটু চমকে উঠে বলল, কী বলছ?

তুমি বরং বেশি পয়সার লোভ দেখিয়ে লাইনের বাইরে ট্যাক্সি ধরো।

পাগল! লাইনের বাইরে ট্যাক্সি ধরা বিপজ্জনক।

তোমার সবতাতেই এত ভয় কেন বলো তো! ওই তো লোহার বেড়ার ওপাশে কত ট্যাক্সি। লোকেরা উঠে উঠে চলে যাচ্ছে। কলকাতার ট্যাক্সি-ওয়ালারা এখনো অত খারাপ হয়ে যায় নি যে, চুরি বা ছিনতাই করবে। আর আমাদের ভয়ই বা কী বলো, আমাদের তো সবই গেছে।

তা বটে, কিন্তু বেশ তো দাঁড়িয়ে ছিলাম।

এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে রাত বারোটা বেজে যাবে।

এ কথায় আরো একটু যেন আতঙ্কিত হলো সুমন্ত্র। চারদিকে অসহায়ভাবে তাকাল!

বুলা তাড়া দিলো, যাও না, গিয়ে একটু কথা বলেই দেখ। আমি লাইন রাখছি।

অগত্যা সুমন্ত্র পা বাড়াল। ভগবান বলে কিছু কি আছে? না থাকাই সম্ভব। থাকলে মানুষকে পদে পদে এত বিপদে পড়তে হবে কেন? ওই যে বে-লাইনের ট্যাক্সি ওরা যে সুবিধের লোক না তা সুমন্ত্র জানে। কত টাকা বেশি চাইবে কে জানে। তার ওপর হয়তো অগত্যা সওয়ারি তুলবে। টাকার জন্য সুমন্ত্র চিন্তা করে না। তার অ্যাটাচি চুরি গেলেও বুলার হাতব্যাগে কিছু টাকা আছে। শ্বশুরের কাছ থেকেও ধার নিতে পারবে। কিন্তু এই সব ট্যাক্সিতে ওঠাটাই কি বিপজ্জনক নয়!

সুমন্ত্র চার পা এগোতে না এগোতেই একটা দুর্দান্ত পুরুষালি ভরাট গলার মন্দ্র স্বর শোনা গেল, আরে এই বুলা! তুই কোথ্‌ থেকে?

সুমন্ত্র ফিরে তাকাল। দাড়িওয়ালা দুর্দান্ত চেহারার এক লম্বা-চওড়া গৌর-বর্ণ যুবক লোহার রেলিংটা টপকে চলে এলো কাছে।

বুলাও উল্লাসে চেঁচাল, শৌনক ! ইস কত'দিন পরে দেখা !

এঃ মা, তুই বিয়ে-ফিয়ে করে একেবারে ফর্টি প্লাস হয়ে গেছিস। জবর-জং দেখাচ্ছে তোকে।

এই আয় আমার বরের সঙ্গে তোর আলাপ করিয়ে দিই। ওগো, এসো না।

সুমন্ত্র এগিয়ে এল।

এই হলো শৌনক, মনে আছে ? বিয়েতে এসেছিল কিন্তু।

শৌনকের কণ্ঠস্বরটি এত ভালো যে, কান পেতে শুনতে ইচ্ছে করে। সেই সম্মোহনকারী গলায় একটু হেসে বলল, আরে যাঃ, আমরা যা বিরাট গ্রুপ গিয়ে কেলো করেছিলাম তোর বিয়েতে, অতজনকে কি এখনমনে রাখা সোজা !

সুমন্ত্র আমতা আমতা করে বলল, একটু একটু মনে আছে।

এ কি তোর ছেলে ?

হ্যাঁ।

আরে বাঃ, তুই তো একদম বুড্‌টি মেরে গেছিস তাহলে। কিচ্ছু মাইণ্ড করবেন না সুমন্ত্রবাবু, বাচ্চাটা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে আপনাদের। বিয়ের পর একটু ঝাড়া হাত পায়ে দু'চার বছর কাটানো উচিত ছিল।

বুলা চোখ পাকিয়ে বলল, খুব অসভ্যতা হচ্ছে। লোক শুনছে না ? ছেলে হয়েছে বেশ হয়েছে। তোর কী ?

আচ্ছা আচ্ছা বাবা। আরও হোক। তা এখানে লাইনে চুপসে দাঁড়িয়ে আছিস, চল আমার সঙ্গে।

তোর গাড়ি আছে ?

আরে না, ট্যাক্সি। চল চল। আসুন দাদা। এইটে কি তোর স্যুটকেস ? তোকে নিতে হবে না।

শৌনক কথাটা গ্রাহ্য না করে স্যুটকেস তুলে নিল। তাড়া দিয়ে বলল, আয় আয়।

শোন, শোন, তুই কোথায় যাবি ?

আমি যেখানেই যাই, তোকে সল্ট লেক-এ পৌঁছে দিয়ে যাবো।

বুলা সুমন্ত্রর দিকে তাকিয়ে বলল, দেখলে তো, বে-লাইনে কেমন সবাই যাচ্ছে !

সুমন্ত্র জবাব দিলো না। ভগবান বোধহয় আছেন। কিংবা থাকলেও থাকতে পারেন।

ট্যাক্সিতে আরও একজন ছিল। যুবক। শৌনক তাকে সামনের সীটে পাঠিয়ে দিলো। পিছনে তিনজন।

ট্যাক্সিওয়ালা কী একটু আপত্তি করছিল, ফের সওয়ারি তুললেন দাদা, রাত হয়ে যাচ্ছে।

শৌনক চাপা গলায় বলল, সোজা নিয়ে লক-আপে ভরে দেবো, বুঝলে ? আগে সল্ট লেক চলো।

ট্যাক্সিওয়ালা বুঝে গেল। তারা জানে কার সঙ্গে গণ্ডগোল করতে নেই। সুমন্ত্র ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে তার উপলব্ধি হলো, এই দুই যুবকের অতিশয় শক্তিশালী ও উত্তপ্ত উপস্থিতির কাছে যে-কেউ উদ্যত ফণা নামিয়ে নেবে। এরা জানে কাকে কীভাবে চালাতে হয়।

ট্যাক্সি ছাড়ার পর বুলা বলল, ভাগ্যিস তোর সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল। নইলে কী যে মুশকিলে পড়েছিলাম। তুই কোথায় গিয়েছিলি ?

সে অনেক দূর। ট্রেকিং করতে। তমসা ভ্যালি।

ও বাবা !

বাবা ডাকছিস কেন ? তমসায় এখন হাজার হাজার ট্রেকার যায়।

বেশ আছিস।

আছিই তো। তোর মতো বিয়ে করে ন্যাদস হয়ে গেছি নাকি ?

মারব থাপ্পড়। আমি ন্যাদস ?

শৌনক সুমন্ত্রর দিকে চেয়ে বলল, কিছু মনে করবেন না দাদা, আপনি

আমার বেস্ট ফ্রেণ্ডকে প্রায় সীতা হরণের মতো করে নিয়ে গেলেন। আমার খুব ইচ্ছে ছিল বুলাকে বিয়ে করে ফেলি। একটু ঝগড়াটে, একটু বোকা ঠিকই, কিন্তু চলেব্ল্। তাছাড়া পুরনো বন্ধু।

তোকে বিয়ে করতে বয়েই গিয়েছিল আমার। বকবক করে মাথা ধরিয়ে দিতিস তাহলে।

আমি একটু বেশী কথা বলি ঠিকই, কিন্তু আমার কথা শুনতে কোন্ মেয়ে না ভালবাসে বল।

সুমন্ত্র অতি দ্রুত মনে মনে মিলিয়ে দেখছিল। তার তুলনায় এই শৌনক ছোকরা কি অনেক বেশী সুপুরুষ এবং সাহসী ও পৌরষযুক্ত নয়?

একপাশে সুমন্ত্র, অন্য পাশে শৌনক মাঝখানে বুলা। বুলা আর শৌনক অতিশয় গাঢ় গলায় পুরনো সব কথা বলতে লাগল। সুমন্ত্র কান দিলো না। সে ছেলেকে কোলে শুইয়ে চোখ বুজে পাহাড়ের কথা ভাবতে লাগল। দুঃসাহসী যুবকেরা দুর্গম সব পাহাড়ে গিয়ে ওঠে, নৌকোয় সমুদ্র পাড়ি দেয়, আরও সব কী কী করে। তার জীবন ওরকম নয়। সে ছিল গুড বয়। ওই গুডনেস আর কখনো ছাড়ে নি তাকে।

কিন্তু গুড বলা কি ঠিক হবে? চাকরিতে সে দেদার ঘুষ পায় এবং খায়। এই বয়সেই সে বেশ কিছু টাকা করে ফেলেছে। আরও আসছে। রাশি রাশি টাকা। সে কি গুড বয়?

তারপর কী হলো?

কী আবার হবে। আমি পাইওনীয়ারিং করলাম। পা রাখার জন্য ঠিক আট ইঞ্চি চওড়া জায়গা ছিল, তাও বরফে পিছল। দু'ধারেই খাদ, তিন হাজার ফুট, পারফেক্ট রিজ যাকে বলে।

ইস, শুনেই গা শিরশির করে। হেঁটে চলে গেলি?

পাগল: হাঁটতে গেলেই বিপদ। গেলাম হামাগুড়ি দিয়ে। কখনো ঘোড়ায় চাপার মতো দু'ধারে পা ঝুলিয়ে বুকে হেঁচড়ে।

কতখানি?

পঞ্চাশ মিটার হবে।

শুনে সুমন্ত্ররও গা শির শির করছিল। ঘুমন্ত ছেলের দিকে একবার মায়াভরে তাকাল সে। না, ছেলেকে কখনো কোনো বিপজ্জনক খেলাধুলো বা অভিযান করতে দেবে না সে।

৪

মাঝে মাঝে এই [redacted] ভিতর থেকে মুখ তুলে আইক দীর্ঘ [redacted] ডাক ছাড়ে। [redacted] ধরে এ বাড়িতে সে একনিষ্ঠভাবে রয়ে গেছে। চোর বা আগন্তুক আজকাল সকলকেই সমদর্শীর মতো ক্ষমা করে দেয় সে। বয়সের ভার সমস্ত শরীরে ক্লান্তির মতো ছড়িয়ে থাকে। পিছনের প্রিয় বারান্দায় সারাদিন নিজের মধ্যে ডুবে থাকে সে।

অর্চনা টের পায়, আইক বেশিদিন আর বাঁচবে না। গড়পড়তা চোদ্দ বছর কুকুরদের আয়ু। আইকের বারো বছর হলো। আইক মরে গেলে সবচেয়ে বেশি দুঃখ হবে তার। সারাদিন আর কেউ বাড়িতে থাকে না। আইক থাকে। পায়ে পায়ে আইক-ই ঘুরঘুর করে বেড়ায়, সঙ্গ দেয়। আগে ছিল, যেখানে অর্চনা সেখানেই আইক। আজকাল আইক খুব ঝিমোতে ভালবাসে।

রান্নাঘরের গরম থেকে বেরিয়ে পাখার তলায় একটু জুড়োলো অর্চনা। তারপর স্নান করে পাট-ভাঙা একখানা তাঁতের শাড়ি পরল। অর্চনা স্বভাব-সুন্দরী। না সাজলেও তার চলে। আর এই মধ্য চল্লিশেও ছিপ-ছিপে তার গড়ন। পথে-ঘাটে ছোকরারা এখনো পিছু নেয়, শিস দেয়। প্রেমপত্র এখনো পায় অর্চনা।

স্বামীর বন্ধুদের বা বান্ধবীদের স্বামীদের সপ্রশংস বা লোভী চোখ তাকে কিছু কম জ্বালাতন করে না। আর দুঃসাহসী শরীর লোভীদের আক্রমণ সেই কৈশোর থেকে আজ অবধি কিছু কম ঠেকাতে হয় নি তাকে। এখনো

পরিপূর্ণ যুবতীই রয়ে গেছে অর্চনা। ধেড়ে ধেড়ে তিন ছেলে মেয়ের মা তাকে কেউ বলবে না। বললে অবিশ্বাস করে লোক।

আয়নার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়াতে ভালোই লাগে তার। এমন গড়ন তার ছুই মেয়ের নেই, বান্ধবীদের নেই। ফিলমে নামবার বহু ডাক পেয়েছিল অর্চনা। দু'বার দুটো ছোটো রোল করেছিল! তারপর ব্যাপারটা তার আর ভালো লাগে নি। নায়িকা হওয়ার সুযোগ পেলে হয়তো আগ্রহ হতো। কিন্তু তার গলার স্বরটা একটু তীক্ষ্ণ আর সামান্য ভাঙা বলে সে সুযোগ হয় নি।

অর্চনা সিঁদুর দেয় না, শাঁখা বা নোয়া পরে না। একসময়ে সবই পরত। তারপর কেমন যেন মনের মুক্তি ঘটে গেল। বিরক্তি এলো। সব ছেড়ে দিলো।

সুবীরের সঙ্গে এই যে একত্র বসবাস এটাকে বিবাহিত জীবন বললে ক্ষতি নেই, না বললেও ক্ষতি নেই। তার সঙ্গে সুবীরের অ-বনিবনা চিরকালের। কেন যে এরকম একটা বিপরীত বিয়ে হলো তার! অথচ সে নিজেই পছন্দ করেছিল সুবীরকে। বার্নপুরে তখন তাদের বাড়িতে আসত চমৎকার ঝল-মলে সেই যুবা।

একটা টিপ পরল অর্চনা। সামান্য প্রসাধনেই তাকে এত ভালো দেখায় যে, তাকে কোনোদিনই তেমন সাজতে হয় না।

অর্চনার লজ্জা একটাই। সে যখন তার জামাইয়ের চোখে মুগ্ধতা দেখে তখন ভিতরে ভিতরে কুঁকড়ে যায়। নইলে জামাই হিসেবে সুমন্ত্র চমৎকার ছেলে। ওকে পছন্দও করে অর্চনা। কিন্তু শত হলেও পুরুষ মানুষ। রূপের সামনে কে না বিহ্বল হয়ে পড়ে।

আইক।

আইক লেজটা সামান্য নাড়ল।

বারান্দার পাখাটা ছেড়ে ইজিচেয়ারে বসল অর্চনা। আইকের মাথায় একটু হাত বুলিয়ে আদর করল।

আবছায়ায় দেখতে পেল ঝুমা পিছনের বাগানে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে।

ঝুমা।

ঝুমা দাঁড়াল, কী বলছ?

অবুদের কিছু খেতে দিয়েছিস?

বলোনি তো।

সবই বুঝি বলতে হবে?

ঝুমাকে আজকাল এরকমই কথায় কথায় বকুনি খেতে হয় অর্চনার কাছে। অর্চনা যে বকে, বড্ড বকে ওকে তা সে নিজেও জানে। জেনেও কেন যেন সামলাতে পারে না নিজেকে। ওই যে কুমারী বয়সের ভারহীন দিনযাপন ওটাকেই ভারী হিংসে হয় কি তার? ওই যে নানা সম্ভাবনায় ভরা স্বপ্নময় ভবিষ্যৎ সামনে রেখে প্রজাপতির মতো উড়ে বেড়ানো ওটাই জ্বালা ধরায় তার মনে?

কে জানে!

ঝুমা বারান্দায় উঠে এসে বলল, কী করতে হবে বলো।

গলায় ঝাঁঝ। বিরক্ত। উদ্ধত। অর্চনার ইচ্ছে করল গালে ঠাস করে একটা চড় কষাতে। কিন্তু এই বয়সটা ভালো নয়। আজকালকার মেয়ে, হঠাৎ কী করে বসে। পালিয়ে যেতে পারে, গায়ে আগুন দিতে পারে। ওর টেবিলে দু-একবার সুইসাইডাল নোট পেয়ে অর্চনার নাড়ী ছাড়ার অবস্থা হয়েছিল।

অর্চনা গম্ভীর গলায় বলল, ওরা বাগানে বসে আছে। প্লেটে সাজিয়ে কিছু খাবার দিয়ে আয়।

ঘরে এসে খেলেই তো পারে। বাগানে দিয়ে আসতে হবে কেন? কোথাকার লাটসাহেব?

ওভাবে কথা বলছিস কেন? বাগানে চাঁদের আলোয় বসে আছে, থাক না।

জ্যোৎস্নায় আমারও বেড়াতে ইচ্ছে করছে।

ফের মুখে মুখে কথা?

তুমি দাদাকে এত ইম্পর্ট্যান্স দাও কেন? না দিলে তো কথা বলতে হতো না। আমি যদি আমার কোনও ছেলে বন্ধু নিয়ে এসে বাগানে গিয়ে বসি, তুমি দাদার হাত দিয়ে খাবার পাঠাবে?

এ কথায় অর্চনা এত অবাক হলো। আশ্চর্য স্পর্ধা হয়েছে তো মেয়েটার!

কী বললি? ছেলে-বন্ধু নিয়ে বাগানে এসে বসবি?

যদি বসতাম?

খুব তো মুখ হয়েছে দেখছি।

মোটেই মুখ হয় নি। তুমি মুখ আনতে বাধ্য করছ।

অর্চনা আর নিজেকে সামলাতে পারল না। হাত বাড়িয়ে মেয়ের গালে একটা চড় বসিয়েই দিলো।

হারামজাদী।

আশ্চর্যের বিষয়, ঝুমা নড়ল না। সরেও গেল না। ঋজু শরীরে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আরও মারবে? মারো না!

এত সাহস কোত্থেকে হলো? কটা ছেলে-বন্ধু জুটিয়েছিস?

কথাটা তোমার ছেলের বান্ধবীকেও তো জিজ্ঞেস করতে পারো। যাও না, গিয়ে জিজ্ঞেস করো.তো, তার কেন এত ছেলে-বন্ধু? কেন সে তোমার ছেলের সঙ্গে এত রাত অবধি সল্ট লেক-এ আড্ডা মারছে।

তাতে তোর কী?

ঝুমা সপাটে বলল, আমার কিছুই নয়। শুধু আমি জানতে চাইছি তোমার বিচারটা এত একপেশে কেন।

মেয়েকে চড় মারার উত্তেজনায় হাঁফাচ্ছিল অর্চনা। এত বড় মেয়ের গায়ে হাত তোলার জন্য যতটা মানসিক শক্তি খরচ হয় ততটা চট করে পূরণ হয় না। বিশেষত মেয়ে যখন ভয় পাচ্ছে না, মাথা নিচু করছে না, অপরাধী ভাবও নেই।

অর্চনা গর্জন করল, চুপ করবি কি না।

আমাকে তুমি আর কত চুপ করিয়ে রাখবে? তুমি কি আমাকে পুতুল পেয়েছো? দুটো কাজের লোক বাড়িতে থাকতেও আমাকে কেন গিয়ে খাবার দিয়ে আসতে হবে ওদের? কাজের লোক খাবার দিয়ে এলে কি দাদার প্রেস্টিজে লাগে?

কথাটা যুক্তিযুক্ত। অর্চনার দুটো কাজের লোক। কিন্তু অবু কাজের লোকের হাতে খাবার বা জল পাঠালে সাঙ্ঘাতিক রেগে যায়। অর্চনার কোনো যুক্তিবোধ ছেলের ব্যাপারে কাজ করে না। কাজ করে অন্ধ আবেগ।

অর্চনা মেয়ের গালে হয়তো আর একটা চড় মারত। কিন্তু অবু বান্ধবীকে নিয়ে বাগানে বসে আছে। বেশী চেঁচামেচি হলে মুশকিল।

সুতরাং অর্চনা চাপা হিংস্র গলাতেই বলল, নষ্ট! নষ্ট মেয়ে কোথাকার! যা, আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যা।

ঝুমা একটা তেজী ভঙ্গিতে অর্চনাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্য করে ঘুরে আবার বাগানে চলে গেল।

পিছনের বাগানে সবজির নিবিড় ফলন হয়েছে। পাতাল রেলের মাটি কয়েক লরি ফেলিয়েছে এখানে অর্চনা। সার দিয়েছে। তারপর বাছাই বীজ আর চারা এনে লাগিয়েছে নিজের হাতে। এই তার শখ। বাগান। এই গ্রীষ্মে ঢেঁড়স, পটল, লঙ্কা সবই ফলাতে পেরেছে সে। পিছনে আড়াই কাঠার মতো জমি সবুজে সবুজ। নিবিড় গাছপালার ভিতর দিয়ে পায়ে-চলার সরু পথ।

গ্রীষ্মকালে বাগানটা খুব নিরাপদ নয়। সল্ট লেক-এ সাপের প্রচণ্ড উৎ-পাত। এ বাড়িতে আসার পর অন্তত দশ বারোটা গোখরো আর কেউটে মারা হয়েছে। মেয়েটা ঘুরছে বাগানে। কাজটা ঠিক হচ্ছে কিনা কে জানে!

অর্চনা মেয়েকে ঘরে আসতে বলবে কি না তা বুঝে উঠতে পারল না। হয়তো কথা শুনবে না। হয়তো বাজে একটা জবাব দেবে।

অর্চনা উঠে এলো। সুবালাকে দিয়েই খাবার পাঠাল। তারপর নিজের ঘরে এসে চুপচাপ কিছুক্ষণ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল। রাগে, ক্ষোভে, অসহায়-তায় তার শরীর দিয়ে আগুন ছুটছে। চোখে সহজে জল আসে না। অর্চনার। এলে বোধহয় খানিকটা উত্তাপ বেরিয়ে যেতে পারত শরীর থেকে। কথায় কথায় সে কাঁদতে পারে না। আর তার পাগলা অনিয়ন্ত্রিত রাগটা তাকেই ছিঁড়ে খায়।

ফ্রিজ থেকে ঠাণ্ডা জলের বোতল বের করে সরাসরি কনকনে ঠাণ্ডা জল খেল সে। টনসিলাইটিস তার আছেই, সর্দির ধাতও। কিন্তু ঠাণ্ডা ভিতরে না গেলেই নয় এখন। বোতলটা কপালে, গালে, কানে বার বার চেপে চেপে ধরল সে।

নিজের ঘরে ফিরে আসবার জন্য পা বাড়িয়েছে, ঝপ্ করে অভদ্রের মতো নিবে গেল আলো। ইনভার্টারের জোরে আবার জ্বলল। অপ্রয়োজনীয় আলো আর পাখাগুলো নিবিয়ে দিলো সে। নইলে ইনভার্টারের সব তেজ ফুরিয়ে যাবে। শুধু বসবার ঘরের একটা স্টিকলাইট জ্বালানো রইল।

টেলিফোনটা বাজতেই অস্থির অর্চনা চমকে উঠে স্থির হলো। ন'টা বাজে কি ?

সদর দরজার মাথায় চমৎকার ইলেকট্রনিক দেয়াল ঘড়িটার দিকে আপনা থেকেই চোখ চলে গেল তার। হ্যাঁ, ঠিক ন'টা।

তাহলে কি ও ফোন করছে ?

অর্চনা টেলিফোনে 'হ্যালো' বলতে পছন্দ করে না। টেলিফোনটা তুলে নিয়ে একটু হাঁফধরা গলায় বলল, বলুন।

অর্চনা, আমি।

আবার ট্যুর ছিল বুঝি ! অনেকদিন গলাটা শুনিনি।

কুড়ি দিন।

এবার কোথায় কোথায় ?

হায়দ্রাবাদ, সেকেন্দ্রাবাদ, ঔরঙ্গাবাদ। এবার সব বাদ।

বেশ চাকরি। বেড়ানোও হচ্ছে, চাকরিও করা হচ্ছে।

হাঁপাচ্ছো কেন?

কোথায় হাঁপাচ্ছি?

শ্বাসের শব্দ পাচ্ছি।

অর্চনা একটু হেসে বলল, আজ মেয়ে জামাই আসছে, এতক্ষণ রান্নাবান্না করে এই বেরোলাম রান্নাঘর থেকে। দম নেওয়ার সময় ছিল না।

একেই বলে সুখের সংসার।

খুব সুখ। এসে দেখে যেও একদিন। আসবার তো মুরোদ নেই।

ও বাবা। তোমার সামনে গিয়ে দাঁড়াবো ভাবতেই পারি না।

দাঁড়ালে কী হবে?

হয়তো হার্টফেল হয়ে যাবে।

ইস্, বাড়াবাড়ি। তোমার হার্ট মোটেই অত দুর্বল নয়।

কী করে বুঝলে?

হার্ট দুর্বল হলে টেলিফোনেও কথা বলতে পারতে না।

টেলিফোন করার সময়েও বুক দুরদুর করে।

এ-যুগে কেউ এত নার্ভাস হয় নাকি? এই তো আমার ছেলে অবু কত অনায়াসে তার মেয়ে-বন্ধুদের সঙ্গে মেশে, এমন কি বাড়িতে অবধি নিয়ে আসে।

জানি। এ-যুগে তো রোমান্স নেই। আমাদের আমলে ছিল।

বেশি বোকো না তো! আমাদের আমল আবার কোন্‌টা? তুমি কি বুড়ো নাকি?

তুলনামূলকভাবে বুড়োই।

তাহলে তো আমিও বুড়ি।

কণ্ঠস্বর একটু চুপ করে থেকে এক পর্দা চাপা গলায় বলল, ও-কথা বলো না। বয়সের কথা উঠলে আমার ভীষণ অস্বস্তি হয়।

তাহলে নিজেকে বুড়ো ভাববে না বলো!

না, অর্চনা আমি সেই অর্থে বুড়ো নই। কিন্তু মনের দিক থেকে সেকেলে।

সেকেলে সে তো হাড়ে হাড়ে জানি। নইলে কেউ শুধু গলার স্বরের সঙ্গে প্রেমে পড়ে?

অর্চনা, কথাটা ঠিক হলো না। তোমাকে আমি দেখেছি। একবার নয়, বেশ কয়েকবার। ট্যুরে যাওয়ার আগের শুক্রবারেও দেখেছি।

কোথায় বলো তো!

বাজারে। বেলা তখন ন'টা হবে।

তাহলে দেখেছো। কিন্তু তোমাকে তো দেখিনি কখনো।

হয়তো দেখেছো। কিন্তু কোন্‌জন আমি তা জানো না।

শোনো, একদিন চলে এসো।

এই তো ভালো। মাঝে মাঝে টেলিফোন করব। কথা হবে। এরকম করেই একদিন খেলাটা শেষ হয়ে যাবে।

আমার তো খেলাটা শেষ করতে ইচ্ছে করে না।

আমারও করে না।

বাজারে সেদিন আমাকে কেমন দেখাচ্ছিল বলো তো!

তোমাকে সবসময়েই তো অপরূপ দেখায়। চওড়া পাড়ের একটা সাদা শাড়ি পরেছিলে। মাথায় একটা সিল্কের স্কার্ফ ছিল।

ও বাবা, পোশাকটা পর্যন্ত মুখস্থ?

মুখস্থ না হয়ে উপায় আছে? গত পঁচিশ দিন ধরেই তো ওই মূর্তি ধ্যান করেছি।

খুব বুড়ি-বুড়ি লাগছিল না তো!

তোমাকে! কোনোদিন লাগবে না।

সেদিন কী হয়েছিল জানো? সকালবেলায় হঠাৎ দেখি ডীপ ফ্রিজে মাছ নেই। আগে খেয়াল করি নি। কর্তাকেতবু ডিম ভাজা দিয়ে চালানো যায়, কিন্তু মাছ না হলে অবুর চলে না। হয়তো বাড়িতে খাবেই না সেদিন।

তাই তাড়াতাড়ি সকালের রান্নাটা কোনোরকমে নামিয়েই বাজার ছুটেছি।
ভালো করে সাজিওনি।
তোমার ছেলেটি কেমন বলো তো!
কেন, ভালোই তো! এ আবার কী প্রশ্ন!
ভাবছিলাম, তুমি বোধহয় ছেলেকে একটু বেশি আসকারা দাও।
আসকারা! তা হয়তো একটু দিই। ছেলেটা ছোটো থেকেই ভীষণ আমার ন্যাওটা।
বাপের সঙ্গে বনিবনা এখন কেমন?
ওই একরকম। এক ছাদের তলায় দু'জন থাকে, এই মাত্র।
বেশ বলেছো, দু'জনের মধ্যে কী একটা গণ্ডগোল চলছিল বলেছিলে, সেটা কি মিটে গেছে?
মিটবে না। পারসোনালিটি ক্ল্যাস কি সহজে মেটে?
কণ্ঠস্বরটি কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, নিজেকে কেন সেকেলে লাগে জানো? আমার বাবার এখন তিরাশি বছর বয়স। এখনো তাঁর সামনে বসে কথা বলতে পারি না। দাঁড়িয়ে বলি।
তোমার বড্ড বাড়াবাড়ি।
ছেলেবেলা থেকে ওই অভ্যাস যে। তিরাশি বছর বয়স হলে কী হয়, এখনো সাঙ্ঘাতিক তেজ। সেদিন একটা মজার ঘটনা ঘটেছে। বলব?
বলো না।
আমাদের একটা ডেশুণ্ড কুকুর আছে।
ওই যে বেঁটে বিচ্ছিরি কুকুরগুলো?
হ্যাঁ। বাবা রোজ ওটাকে নিয়ে সকালে বেড়াতে যান। একদিন সকালে বেরিয়েছেন, হঠাৎ গোটা দুই দেশী কুকুর ডেশুণ্ডটার ওপর হামলা শুরু করল। রোজই করে। কিন্তু সেদিন দেশী কুকুরদের সঙ্গে একটা অ্যাল-সেশিয়ানও এসে জুটল। আশপাশের কোনো বাড়ির কুকুর হবে। ছাড়া পেয়ে চলে এসেছিল। বাবা পড়লেন মহা বিপদে। লাঠি নিয়ে তিনি তাড়া

করলে দেশী কুকুরেরা ভয় পায় বটে, কিন্তু অ্যালসেশিয়ান ঘাবড়ায় না। সে ডেগুওকে কামড়াবেই। আর আমেদের কুকুরটাও ভয় পেয়ে তখন বাবার পায়ের ফাঁকে ঢুকে কুঁই কুঁই করছে। পায়ে কুকুরের শেকল জড়িয়ে যাওয়ায় বাবার হাঁটা বন্ধ।

অর্চনা খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, পারোও তুমি গল্প বানাতে

সত্যি বলছি। আমার কাছে কুকুর হচ্ছে পৃথিবীর ভয়াবহতম জীব। ওই অবস্থায় আমি পড়লে বোধহয় অজ্ঞান হয়ে যেতাম।

তুমি কুকুরকে অত ভয় পাও কেন?

কুকুরের কামড় খেয়ে পেটে চোদ্দটা ইনজেকশন নিতে হলে তুমিও পেতে।

তোমাকে কামড়েছিল?

উঃ সে কথা ভাবতেই কেমন করে।

আমাদের কুকুরটার কী যে হয়েছে। শুধু ঝিমোয়।

আইকের কথা বলছ?

হ্যাঁ। বয়স হলো, ভাবছি এবার বুঝি মরে-টরে যায়। হ্যাঁ, তোমার বাবার কথা কী বলছিলে?

ওঃ? হ্যাঁ, তারপর বাবা এই তিরাশি বছর বয়সেও ওই সিচুয়েশন থেকে ডেগুওটাকে অক্ষত অবস্থায় ঠিক বাড়ি ফিরিয়ে আনলেন। শেষ অবধি নাকি উপায়ন্তর না দেখে তিনি নিজেই কুকুরের নকল করে ঘেউ-ঘেউ করতে শুরু করেন। আর তাতেই ভড়কে গিয়ে অ্যালসেশিয়ানটা পালিয়ে পালিয়ে যায়।

যাঃ! অর্চনা খুব হাসল।

তুমি হাসছো? আমরা কিন্তু হাসি নি।

ও'মা! এটা হাসির কথা নয়?

নিশ্চয়ই। কিন্তু বাবা যখন হাসির কথাও বলেন তখনো আমরা হাসি না। গম্ভীর মুখ করে শুনি। আচ্ছা, ওই কি তোমার আইকের ডাক শোনা

গেল ?

হ্যাঁ, মাঝে মাঝে ওরকম ডেকে ওঠে বিনা কারণে।

কুকুরটাকে তুমি ভীষণ ভালবাসো। না ?

ওই তো আমার সারা দিনের সঙ্গী। বারো বছর হয়ে গেল। মায়া তো পড়বেই। শোনো একদিন সত্যিই চলে এসো। তোমাকে আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করে।

দেখলে কিন্তু দ্বিতীয়বার দেখতে ইচ্ছে করবে না। আমি কিরকম দেখতে বলো তো।

যেমনই হও, আমার তাতে কিছু আসে যায় না।

যদি মোটে চার ফুট এগারো ইঞ্চি লম্বা হই, আর ভীষণ কালো, মোটা, তাহলে ?

অর্চনা হাসছিল। বলল, তাতেই বা কি ?

যদি দেখ যে, আমার একটা পা কাঠের, দাঁত উঁচু এবং ভীষণ ট্যারা ?

এরকম তো হতেই পারে। চালাকি কোরো না।

তাহলে তুমি আরো কিছুদিন দেখা দাও, দেখা দাও করো, তাহলে ঠিক দেখা দেবো।

আহা রে, উনি যেন ভগবান যে, 'দেখা দাও, দেখা দাও' করতে হবে।

আমি ভগবান নই অর্চনা, তবে তুমি বোধহয় আমার ঈশ্বরী।

ফের ? ফোন রেখে দেবো কিন্তু ?

রাখবার বোধহয় সময় হয়েছে।

কেন ?

আমাদের ফোনটা আজ আউট অফ অর্ডার। এক ডাক্তার বন্ধুর চেম্বার থেকে ফোন করছি। সে এতক্ষণ ছিল না। এইমাত্র তার গাড়ি এসে থামল।

আজ মেজাজটা খুব খারাপ ছিল, জানো? মেয়েটা, মানে ঝুমু বড্ড বেয়াড়া হয়েছে। এমনভাবে ঝগড়া করল আজ। ঠিক তুমি যখন ফোন করলে

তার একটু আগে। ভীষণ রেগে গিয়েছিলাম। তোমার ফোনটা পেয়ে মন ভালো হয়ে গেল। আবার কবে ফোন করবে?

শীগ্‌গীরই।

এর মধ্যে আবার ট্যুরে যাবে না তো?

গেলে জানাবো। আমার চাকরির অর্ধেকই হলো ট্যুর।

আর শোনো, তোমাকে আমি ঠিক খুঁজে বের করব।

কিভাবে?

একজন বুড়ো মানুষ একটা ডেশুণ্ড কুকুর নিয়ে সকালে বেড়াতে বেরোন। সল্ট লেক-এর মতো ফাঁকা জায়গায় ঠিক আমি তাঁকে খুঁজে বের করব। তারপর ঠিকানা পেতে আর কতক্ষণ।

কণ্ঠস্বর হাসল। বলল, তুমি সেই চেষ্টা কখনোই করবে না জানি।

কিভাবে জানলে?

তোমারও কি ভয় নেই?

না। আমার কথা তো জানো না।

জানি। আর এও জানি, তোমার সেই সাহস আছে। কিন্তু পেরে উঠবে না। অতটা পরিশ্রম করার ইচ্ছেই হবে না।

ঠিক হবে। দেখো।

ঝুমা কোথায়?

বাগানে ঘুরছে।

ঝুমার কিন্তু বেশ পার্সোনালিটি আছে।

কি করে বুঝলে?

রোজ তো আর তুমিই প্রথম ফোন ধরো না। এক একদিন এক একজন ধরে। কখনো সুবীরবাবু, কখনো অবু, কখনো ঝুমা। প্রত্যেকের গলা আমার চেনা হয়ে গেছে। ঝুমার গলা যতবার শুনেছি প্রত্যেকবার মনে হয়েছে, দারুণ ব্যক্তিত্ব আছে।

তা হয়তো আছে। একটু বিদ্রোহী টাইপের।

সাবধানে হ্যাণ্ডেল কোরো। আজ ছাড়ছি।

আবার কবে ফোন করবে বললে না তো ?

এরপর একদিন বেশি রাতে করব। যখন তোমার বাড়ির সবাই ঘুমোবে। তারপর সারা রাত কথা বলব।

অর্চনা একটু হাসল, দু'বার তো তাই করেছো। পাগল একটা।

ফোনটা একটু আকস্মিকভাবেই কেটে গেল। অর্চনা ফোনটা রাখতে গিয়ে দেখল, দরজার কাছ থেকে বিষদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে ঝুমা দাঁড়িয়ে আছে। চোখে চোখ পড়তেই মুখ ফিরিয়ে চলে গেল আবার বাইরে। শুনেছে কি কিছু ? শুনলে শুনেছে, অর্চনা অত গ্রাহ্য করে না। এ সংসারের কাউকেই সে আর গ্রাহ্য করে না।

অর্চনা শোওয়ার ঘরে এসে আলো জ্বালল। তারপর ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় অনেকক্ষণ ধরে দেখল নিজেকে।

এখনো দারুণ সুন্দরী সে।

এই যে লোকটা মাঝে মাঝে ফোন করে এ অর্চনার একমাত্র প্রেমিক নয়। উল্টোদিকের দুটো বাড়ির পর অজয় মিত্র নামে যে গায়ক থাকে সেও কি অর্চনার রূপমুগ্ধ নয় ? অর্চনার আরো ভক্ত সল্টলেক-এ ছড়িয়ে আছে।

তবে টেলিফোনের এই মানুষটা অন্য সকলের চেয়ে আলাদা। প্রথম যেদিন ওর টেলিফোন এল সেদিন একটু ভয় পেয়েছিল অর্চনা। ভয়টা দ্বিতীয়বারে কাটল। লোকটা ভীতু, নরম প্রকৃতির, অপ্রতিভ। প্রথমে একটা দুটো কথা বলেই ছেড়ে দিত। তারপর সাহস বাড়ল, প্রগল্‌ভ হয়ে উঠল। সেই সাহস জুগিয়েছিল অর্চনাই।

অর্চনা তবু শরীরী নয়। তাকে রোমান্টিক বলা যেতে পারে, কামুকা কখনো নয়। শরীরের ব্যাপারটাকে অর্চনা বরাবরই এড়িয়ে যেতে চেয়েছে। কিন্তু লোভী পুরুষদের হাত থেকে পুরোপুরি আত্মরক্ষা হয়তো সবসময়ে সম্ভব হয় নি। তবু সে মোটামুটি নীতিবাগীশ। স্পর্শকাতর।

প্রিয় বারান্দায় আইকের পাশে এসে ফের বসল অর্চনা। মনটা ভালো হয়ে গেছে। মাথাটাও আর ধরা নেই।

আইকের মাথায় একটু হাত বোলালো সে। বারান্দায় একটু হাওয়া দিচ্ছে এখন। অর্চনা চোখ বুজল। চোখ জড়িয়ে এল একটা মদির সুখে। পূজা পেতে কে না ভালবাসে ?

৫

জানলা বরাবর একসার ক্যাক্টাস। অত্যন্ত ঘনবদ্ধ বলে একটা সবুজ দেয়ালের মতো নীরেট এবং দুর্ভেদ্য। কূটবুদ্ধির সঙ্গে সৌন্দর্যবোধ মিশিয়ে অর্চনা লাগিয়েছে। এই ক্যাক্টাসের দরুন জানলার কাছাকাছি চোরেরা আসতে পারবে না। অথচ দেখতে কী যে সুন্দর। ক্যাকটাসের সারির পাশেইএকটা মানুষ সমান ঝাউগাছের মতো ঝোপ। আর সেই ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে ঝুমা।

অদূরে বাগানে মিথুনমূর্তির মতো জড়াজড়ি অবু আর রত্না। দৃশ্যটা অশ্লীল। তার কারণ, ঝুমা জানে, রত্না এবং তার দাদা অবু কখনোই প্রেমিক প্রেমিকা নয়। ওরা কখনো বিয়ে করবে না, বিয়ের কথা ভাববে না পর্যন্ত।

তার দাদাকে কি সে হিংসে করে? এরকম প্রশ্ন কেউ করলে ঝুমা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলবে, করি। ভীষণ হিংসে করি। বরাবর ওর সঙ্গে ঝগড়া হলে মা আমাকেই তো মেরেছে বা শাসন করেছে! আমাকে কি দাদার বইপত্র বিছানা গোছাতে হয় নি বরাবর? পিঠ চুলকে দিতে হয় নি ওর পড়ার সময়? বড় মাছটা, দুধের সরটা আমাদের দুই বোনকে বঞ্চিত করে কে খেয়েছে বরাবর? কে পেয়েছে চাওয়া মাত্র সাইকেল, দামী স্কুটার, দুর্দান্ত সব জামাকাপড়? এমন কি বাড়িতে বান্ধবীদের নিয়ে আসার স্বাধীনতাও?

শুধু আনাই নয়, অবু এ বাড়িতে অন্তত দু রাত কাটিয়েছে দুই বান্ধবীকে নিয়ে। একবার ঝড়-বৃষ্টির অছিলায় মঞ্জু বাড়ি ফিরে যেতে পারল না। তাকে রাখা হলো গ্যারাজের ওপরে মেজেনাইন ফ্লোরে। ওটাই গেস্টরুম। ঝুমার ঘরেই থাকতে পারত, থাকে নি। সকালবেলায় চা দিতে গিয়ে ঝি

ওদের এক বিছানায় দেখতে পায়। বেচারা ঝি এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখে যখন চোখ বড় বড় করে ছুটে এল অর্চনাকে বলতে, তখন অর্চনা তাকে ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দেয়। সুপ্রিয়া নামে আর এক বান্ধবী একবার বাড়ি থেকে রাগ করে চলে এল। সে নাকি আর ফিরে যাবে না। তাকেও রাখা হয়েছিল এই একই ঘরে। পরদিন আর ঝিকে দিয়ে চা পাঠায় নি অর্চনা। ওরাই একটু বেলায় নিচে নেমে এসেছিল। এবং খুব বেশি লজ্জার ভাবও ছিল না তাদের চোখে মুখে।

দিদি ছিল ভীষণ ঠোঁটকাটা আর ডাকাবুকো। দিদি থাকলে অবুকে ঝামরে দিত। কিন্তু এসব ঘটনা ঘটেছিল দিদির বিয়ের পর।

আবছা জ্যোৎস্নায় ওদের যুগল-মূর্তি দেখতে দেখতে ঝুমা সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল।

তার মা কি আশা করে টেলিফোনের প্রেমিকটির সঙ্গে একদিন শরীরেও ঘনিষ্ঠ হওয়া সম্ভব? কে জানে কী। কিন্তু টেলিফোনটা যখন আসে তার-পর থেকেই অর্চনা একটু অন্যরকম হয়ে যায়। একটু যেন বেশি ভালো, একটু যেন ক্ষমাশীলা, একটু বুঝি স্বপ্নাতুর।

ছাদে যথারীতি সুবীর তার ইজিচেয়ারে খানিকটা নেশায় আর খানিকটা ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে। ছোট্ট টেবিলের ওপর জলের বোতল আর গেলাস, টেবিলের পায়ার কাছে রাখা হুইস্কির বোতল। তার পাশেই খাবারের প্লেট ভেঙে টুকরো হয়ে পড়ে আছে। ছত্রাখান ফিশ-ফ্রাই খেয়ে গেছে বেড়াল।

ঝুমা একটু টিপি টিপি পায়ে এগিয়ে গেল বাবার কাছে। সুবীরের নাক ডাকছে। সে যে আজকাল খুব বেশি নেশা করে তা নয়। আজকাল একটু খেলেই তার নেশা হয়। বেশি খেতে পারে না।

ঝুমা গেলাসে দু'আঙুল পরিমাণ হুইস্কি ঢেলে নিল। অনেকটা জল মেশাল। তারপর চোঁ করে খানিকটা খেয়ে চোখ বুজে ফেলল গলার

জ্বলুনিতে। তারপর বাকিটা খেল ছোটো ছোটো চুমুকে।

এই চুরিটুকু সে সম্প্রতি শিখেছে। হুইস্কি খেলেই ছু'ধারে তার ডানার মতো কিছু একটা গজায় আর তারপর সে যে কোথায় কোথায় চলে যায়। কোন্ কল্পরাজ্যে ঘুরতে থাকে।

সে ঠিক জানে, সে এই নোংরা পৃথিবীর কেউ নয়। একদিন বিভ্রমবশে এক স্বপ্ন রাজ্যের দরজা খুলে সে ঢুকে পড়েছিল রূঢ় নিষ্ঠুর নোংরা এই বাস্তবতায়, একদিন ফিরে যাবে।

দোতলা উঠবে বলে ছাদের রেলিং হয় নি। কার্নিশের ওপর দিয়ে নির্ভয় পায়ে হাঁটছিল ঝুমা। একটু টালমাটাল, সামান্য ঘোর-লাগা দৃষ্টি। প্রায়ই হাঁটে, সে কখনো পড়ে না।

কে রে ? কে রে তুই ?

বিকট এই চিৎকারে ঝুমা এত চমকে গিয়েছিল যে, তার বাড়ানো পা কার্নিশে পড়ল না, পড়ল শূন্যে। ঝিম করে উঠল মাথা, আর বোবা অ্যানি-ম্যাল ইনস্টিংট-এর বশে সে যা পারল আঁকড়ে ধরল।

পড়ল না, ঝুমা, তবে শরীরটাকে হাঁচোর পাঁচোর করে টেনে তুলতে হলো ঝুল-খাওয়া অবস্থা থেকে।

"আমি বাবা ! আমি।"

পরমুহূর্তেই ভুল বুঝতে পারল। সুবীর অর্থাৎ তার বাবা-তাকে দেখতেই পায় নি। সুবীর কথা বলছে অন্য কারো সঙ্গে। কোনো অদৃশ্য মানুষ বা ভূতের সঙ্গে।

ঝুমা বসে পড়ে হাঁফাচ্ছিল।

সুবীর নিচু হয়ে বোতলটা তুলে গেলাসে হুইস্কি ঢালল। জল মিশিয়ে একবার ছু'বার চুমুক দিয়েই গেলাস রেখে ফের ঘুমিয়ে পড়ল।

তার বাবা এরকম করে। নেশায় বা স্বপ্নের ঘোরে কথা বলে ওঠে, চেঁচায় বা গালাগাল দেয়। কার উদ্দেশ্যে যে করে তা কে জানে।

এবড়োখেবড়ো শানে কনুই ছড়ে গেছে ঝুমার। জ্বালা করছে। রক্ত

পড়ছে। ব্যথায় টুঁ শব্দটিও না করে ঝুমা কার্নিশ দিয়ে আবার ঝুলে পড়ল। নিচে তার ঘরের জানলার রেন শেড। তার ওপর নামতে কোনো অসুবিধে নেই। তারপর আর একবার ঝুল খেলেই বেড়ালের মতো মাটিতে নেমে দাঁড়াবে ঝুমা।

আইক চেঁচাল, আউফ।

দেখতে পেয়েছে ? নাকি এমনিই অভ্যাসবশে নালিশ জানাল কাউকে ?

ঝুমা পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে সোজা রান্নাঘরে গিয়ে কৌটো খুঁজতে লাগল।

সুবালা রুটি বেলতে বেলতে বলল, কী খুঁজছো ?

গোলমরিচের কৌটো।

সুবালা উঠে খুঁজে দিলো। ঝুমা অস্বাভাবিক ভাবেমুখটা ফিরিয়ে রইল অন্য দিকে। হুইস্কির গন্ধ যে সাঙ্ঘাতিক তা সে জানে।

কয়েকটা গোলমরিচ মুখে দিয়ে চিবোতে চিবোতে ঘরে এল ঝুমা। ছড়ে যাওয়া জায়গাটায় ওষুধ লাগাল।

তারপর সামনের ঘরে এসে টি ভি ছেড়ে বসল। একজন মাঝ-বয়সী লোক সরোদ বাজাচ্ছে। দশটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ।

সরোদের মাঝখানেই ট্যাক্সির হর্নটা বেজে উঠল।

দিদি এল নাকি ?

একটু লাফিয়ে চমকে উঠল হৃৎপিণ্ড। দিদি যদি গন্ধ পায় ?

পরমুহূর্তেই তার মনে হলো, পেলেই বা ক্ষতি কী ?কী আর এমন বেশি কিছু হবে ? এ বাড়িতে তার না আছে আদর, না কোনো সম্মান। একটু আগেই সামান্য অপরাধে কত অনায়াসে তাকে চড় মারল তার মা।

টি ভিটা বন্ধ করে দিয়ে ঝুমা ফের দ্রুত পায়ে উঠে এল ছাদে।

গন্ধ পাবে ? তাহলে ভালো করেই পাক।

সুবীর তার নেশায় জড়ানো ঘুমে অচেতন। বেড়ালের মতো হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে ঝুমা হুইস্কির বোতলটা খুলল। তার বাবা ইতিমধ্যে গেলাসটা

খালি করে রেখেছে। ঝুমা ইচ্ছেমতো ঢালল। জল মিশিয়ে অতি দ্রুত ছোট্ট ছোট্ট চুমুকে গিলে ফেলতে লাগল। গলা জ্বলছে, বুক জ্বলছে, চোখ ভরে এল জলে। তবু তীব্র এক জেদ আর অভিমানে জোর করে গেলাসটা খালি করে ফেলল সে।

তারপর কিছু একটা হুলুস্থূলু ঘটতে লাগল তার শরীরের মধ্যে। আচমকা শরীর ভীষণ তপ্ত হয়ে গেল, কানে একটা ঝিনঝিন শব্দ হতে লাগল। বমি পেতে থাকল। আর মাথাটা কেমন যেন ফাঁকা হয়ে যেতে লাগল।

বার দুই ওয়াক তুলল ঝুমা। খানিকটা জল চলকে বেরিয়ে গেল।

সেই শব্দে সুবীর নড়ে উঠে বলল, কে রে? বেড়ালটা নাকি? খা ভালো করে খা···সব খেয়ে ফেল···

ঝুমা আতঙ্কিত হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে সরে গেল কার্নিশে। তারপর ফের ঝুল খেয়ে রেন শেড-এ নেমে এক লাফে মাটিতে।

কিন্তু এবার স্বাভাবিকভাবে পড়ল না ঝুমা। পড়ল একটু পুঁটলির মতো। কোমরে বোধহয় ভালোই চোট পেয়েছে সে, কিন্তু শরীরের বোধ তার এখন এত কম যে তেমন ব্যথা বোধ করল না। সমস্ত শরীরটাই যেন ঝিঁঝিঁ ধরার মতো অবশ।

সে কি মাতাল হয়ে গেছে? সে কি টলছে? কিন্তু কী যে একটা হচ্ছে তার মনের মধ্যে। কী যে অদ্ভুত লাগছে! একটুও খারাপ নয়। বরং দারুণ ভালো। ভারী ভালবাসতে ইচ্ছে করছে পৃথিবীকে। মরতেও ইচ্ছে করছে।

ঝুমা সামান্য অবিন্যস্ত পায়ে পিছনের বাগানের গাছপালার ভিতর দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল। পথ ঠাহর করতে পারছিল না। ডালপালায় শব্দ হচ্ছিল।

আইক গম্ভীর বিষণ্ণ গলায় ডাকল, আউফ! আউফ!

ঝুমা পিছনের ফটকে এসে একটু দাঁড়াল। ব্যবহার হয় না বলে এই ফটকটা তার দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। কিন্তু ডিঙোতে কোনো অসুবিধে নেই। ঝুমা গ্রিলের ফটকের খাঁজে পা রেখে উঠল। ডিঙোলো। সারাক্ষণ টলমল

করতে করতে। সে যেন অন্য এক শরীরে ঢুকে পড়েছে আজ। এ যেন তার শরীর নয়, সে নয়।

পিছনে একটা খালি জমি। তারপর রাস্তা। তারপর ফাঁকা, হাহা মুক্ত পৃথিবীর বিস্তার। ঝুমা কেন বাঁধা থাকবে এই একটি বাড়ি ও পরিবারের বন্ধনে? দুনিয়ায় আর সবাই যদি তার পর তাহলে এ বাড়ির লোকও তার পর।

ঝুমা টলছে, পৃথিবী টলছে। মাঝে মাঝে খিলখিল করে হেসে উঠছে ঝুমা। অকারণে এত আনন্দ হয় মাঝে মাঝে। ঝুমা জমিটুকু পেরিয়ে গেল। তারপর রাস্তা ধরে ছুটতে গেল। পারল না। খুব ছুটবার ইচ্ছে হচ্ছিল তার। কিন্তু ইচ্ছের সঙ্গে শরীরটা পাল্লা দিতে পারল না।

পড়ে গিয়ে উঠে দাঁড়াল ঝুমা। তারপর হাঁটতে লাগল। জোরে। আরো জোরে।

একটা ট্যাক্সি বা গাড়ি যদি পেয়ে যেত সে। কিন্তু সল্ট লেক এখন এত ফাঁকা, এত নির্জন, এত ভূতুড়ে যে, কোনো মানুষই নজরে পড়ে না।

হঠাৎ একটা হলুদ রঙ এসে রাস্তাটাকে রাঙিয়ে দিলো। কোথা থেকে এল আলোটা?

ঝুমা ফিরে চাইতে গেল। অমনি ধাঁধিয়ে গেল চোখ একজোড়া জোরালো আলোয়। একটা গাড়ি কি? ভাবতে ভাবতেই ঝুমা হোঁচট খেল। পড়ো-পড়ো হয়েও পড়ল না। হেসে উঠল হি-হি করে।

হাই! বলে হাত তুলল ঝুমা। গাড়ির অন্ধকার অভ্যন্তরে যে আছে সে সাড়া দিলো না। স্পীড বাড়িয়ে এগিয়ে গেল।

হাই! হাই। বলে হাত নেড়ে কয়েকবার ডাকল ঝুমা।

গাড়িটা একটা বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হলো।

ঝুমা দমল না। দুনিয়াটাই তো সৃষ্টিছাড়া আর পাগল। সে মনের আনন্দে টলোমলো পায়ে হাঁটতে হাঁটতে মোড়টা ছাড়িয়ে গেল। দু'ধারেই সুদৃশ্য সব বাড়ি। আলো জ্বলছে। টি ভির শব্দ আসছে। একটা স্কুটার চলে

গেল পাশ দিয়ে। একটা তেজী কুকুর ভীষণ জোরে ডেকে উঠল। একটা বাড়ি পেরিয়ে যেতে যেতে ঝুমা শুনতে পেল কে যেন সিংহ গর্জন করে কাকে বলছে, তুমি একটা রাসক্যাল। আর এই সবকিছু থেকেই ভারী আনন্দ পেতে লাগল ঝুমা। চিৎকার করে সে লোকটার উদ্দেশ্যে বলল, ইউ ব্লাডি ফুল···

তারপর আবার হি হি করে হাসি।

গাড়ির হেড-লাইট আবার উদ্ভাসিত করল পথকে। ধীর গতিতে একটা গাড়ি ঝুমার পিছন থেকে এগিয়ে এল।

ঝুমা হাত তুলল, হাই!

গাড়িটা থামল না। খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগল ঝুমাকে ছাড়িয়ে। তবে জানলা দিয়ে একটা কৌতূহলী মুখ তাকে দেখে নিল ভালো করে। তারপর বলল, হাই!

ঝুমা জানে, গাড়িটা তাকে নেবে। তারপর বহুদূর নিয়ে যাবে। সে হাত তুলে চেঁচাল, গিভ মি এ লিফ্‌ট। হাই!

গাড়িটা তবু এগিয়ে যাচ্ছিল। ধীর গতিতে। ঝুমা প্রাণপণে ছুটতে লাগল। কিন্তু তার মনে হচ্ছিল, সে ছুটছে কোমর সমান জলের মধ্য দিয়ে। এগোতে পারছে না, শরীর টলমল করছে, মাথা কেমন যেন ঘুরপাক খাচ্ছে।

কেউ কি পেছন থেকে তাড়া করে আসছে? একজোড়া দৌড়-পায়ের শব্দ না?

ঝুমা! ঝুমা! একটু দাঁড়াও!

সামনে কয়েকটা ফাঁকা প্লট! কোনো বাড়ি নেই। গাড়িটা একটু এগিয়ে গিয়ে থেমে আছে রাস্তার পাশে।

ঝুমা একবার পিছু ফিরে দেখতে চেষ্টা করল লোকটাকে। দাদা না তো? পাড়া প্রতিবেশী কেউ কি? যে-ই হোক সে আসছে ঝুমাকে ফের অন্ধ-কূপে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য।

ঝুমা প্রাণপণে ছুটতে লাগল।

ঝুমা ! ঝুমা !

একটা লোক গাড়ির দরজা খুলে নেমে দাঁড়াল। আর ঝুমা টলতে টলতে, পড়ো-পড়ো হয়েও ছুটে হেঁচড়ে তার কাছাকাছি চলে এল।

লোকটা হাত বাড়িয়ে ঝুমাকে টেনে নিয়ে গাড়িতে ঢুকেই টেনে দিলো দরজা। তারপর গাড়ি ছুটল নক্ষত্রবেগে।

পিছন থেকে একটা অসহায় স্বর শোনা গেল, শুধু ঝুমা ! ঝুমা ! নামো, ওরা তোমার সর্বনাশ করবে।

গাড়ির মধ্যে তিনজন প্রগল্‌ভ অবাঙালী যুবকের কোলে কোলে তখন খিলখিল করে হাসতে হাসতে গড়াচ্ছিল ঝুমা। ওরা যে কী করছে তাকে নিয়ে তা বুঝতে পারছিল না সে। কাতুকুতু দিচ্ছে ? না কি অন্যরকম কিছু ? খুব খারাপ কিছু ? সে যা-ই হোক তার ভীষণ হাসি পাচ্ছে। ভীষণ…

৬

ঝুমা কোথায় গেল মা। ওকে দেখছি না কেন? এতক্ষণে তো ওর ঝাঁপিয়ে এসে পড়ার কথা।

অর্চনা ঠোঁট উল্টে বলল, কি জানি, আছে কোথাও। একটু রাগ হয়েছে মেয়ের। সামান্য সামান্য কথাতেই আজকাল গাল ভারী হয়। তুই ছেলে-টাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আয় তো। সোফায় শুইয়েছিস, কি জানি বাপু, আমার ভয় করে। কখন গড়িয়ে টড়িয়ে পড়বে।

সে তোমার জামাই শোওয়াবে'খন। বলে বুলা তার বরের দিকে তাকাল। সুমন্ত্র এখনো তমসা উপত্যকার কথা ভাবছে। একফুট চওড়া গিরিশিরার ওপর দিয়ে দু'ধারে তিন হাজার চার হাজার ফুট গভীর খাদের মধ্যে ঠ্যাং ঝুলিয়ে পঞ্চাশ মিটার দূরত্ব পার হওয়ার একটা মানসিক চেষ্টা করছিল সে। হাত পা এমন শিরশির করছিল তার, মাথাটা এমন ঘুরছিল যে, সে প্রকৃতিস্থ হতে পারছিল না। তার অর্ধেক ওই না-দেখা গিরিশিরার ওপরে বসে আছে, বাকি অর্ধেক সল্ট লেক-এর শ্বশুরবাড়িতে গেরস্ত জামাইয়ের মতো জামাইষষ্ঠী করতে এসেছে। দুটি ঝোড়ো দুরন্ত যুবক আজ তাকে এত ওলটপালট করে দিয়ে গেছে যে, শাশুড়িকে প্রণামটা করতে পর্যন্ত তার ভুল।

অর্চনা তার সুন্দর ভ্রূ ওপরে তুলে বলল, 'ওমা, সুমন্ত্র। তুমি সেই থেকে যে চুপচাপ বসে আছো। জামাকাপড় ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে নাও। রাত হয়েছে।

সুমন্ত্র উঠল। একটু ক্লান্ত ও হতাশ স্বরে বলল, ছেলেটাকে বরং আগে শুইয়ে দিই? তিন হাজার ফুট ওপর থেকে পড়ে গেলে···

বলেই জিব কাটল সে। সোফার উচ্চতা তিন ফুটও নয়। বড়জোর দু ফুট হবে। তাড়াতাড়ি লজ্জা ঢাকতে সুমন্ত্র ছেলেকে আড়কোলে তুলে নিল।

শোওয়ার ঘরটা যেন কোন্ দিকে?

এসো। তোমাদের জন্য মেজেনাইন ফ্লোরের ঘরটাই রেডি করে রেখেছি। মেঝে থেকে সিলিং অবধি মস্ত জানলা আছে, দক্ষিণের হাওয়া পাবে। পেডেস্টাল ফ্যানটাও ওই ঘরে। এই যাঃ—

বাতি হঠাৎ নিবে গেল। ঘচাং করে একটা শব্দ হলো। ভাঙল একটা কাঁচের গেলাস এবং সেই সঙ্গে সুমন্ত্রর আর্তস্বর শোনা গেল, ওঃ বাবা।

কী হলো তোমার?

সুমন্ত্র জবাব দিলো না। সেণ্টার-টেবিলে তার হাঁটু ঠুকে গেছে জোরে। ছেলে নিয়ে সে পড়ে যেতে পারত। পড়েনি ভাগ্য ভালো বলে। এখন ন যযৌ ন তস্থৌ সে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে। পায়ের চারদিকে অজস্র ভাঙা কাঁচ। সেণ্টার-টেবিলের ধারে গেলাসটা সে-ই রেখেছিল, জল খাওয়ার পর।

বুলা ঝংকার দিয়ে বলল, কিন্তু ইনভার্টারটার কী হলো? আলো জ্বলছে না কেন মা?

খারাপ হয়ে পড়ে আছে। এখানে একটা ভালো মিস্ত্রিও কি পাওয়াযায়। সল্ট লেক বলে কথা। বড্ড বেশি বাবু জায়গা। দাঁড়া, মোম জ্বালাচ্ছি।

রান্নাঘর থেকে সুবালাই মোম নিয়ে বেরিয়ে এলো।

দেখো বাবা, কাঁচটাচ দেখে এসো। ছেলেটাকে বরং আমার কোলে দাও।

না, না, ঠিক আছে। ও ঘুমের মধ্যেও কোল চিনতে পারে। অদল-বদল বুঝলেই চেঁচাবে।

খুব বাপ-ন্যাওটা করে তুলেছো। পরে ঠ্যালা বুঝবে। এসো সাবধানে এসো। দাঁড়াও টর্চটা আনি। সুবালা, ওপরের ঘরে যা বাতাস, মোমবাতি থাকবে না। তুই হ্যারিকেনটা বরং জ্বেলে দিয়ে আসিস।

সুমন্ত্রকে ওপরের ঘরে পৌঁছে দিলো অর্চনা। চারদিকে টর্চ ফেলে ঘরটা

দেখিয়ে দিয়ে বলল, সব ঠিক আছে তো। হাতের কাছেই জল আছে। ওই কোণে বাথরুম···

ঠিক আছে। সব দেখে নেবো।

পরিপাটি বিছানা করা রয়েছে। মশারি ফেলা এবং গোঁজা। সুমন্ত্র ছেলেকে অয়েল ক্লথের বিছানায় শুইয়ে দিলো। তারপর বলল, আমি বরং এখানে একটু থাকি।

ছেলে পাহারা দেবে বুঝি ঠিক আছে, থাকো। তোমার সঙ্গে শ্বশুরের আজ রাতে দেখা হবে কিনা বুঝতে পারছি না। যদি খাওয়ার টেবিলে এসে বসে তো হবে। অনেক সময়ে খেতেও আসে না। বেশি নেশা হলে গরমে ছাদেই ঘুমিয়ে পড়ে। আমিও ডাকি না।

সুমন্ত্র চুপ করে রইল। এখনো সে তমসা উপত্যকার সেই গিরিশিরা থেকে সম্পূর্ণ নেমে আসতে পারে নি।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে অন্ধকার সিঁড়িতে ছাদ থেকে বুলাকে নামতে দেখল অর্চনা।

তোর বাবার কাছে গিয়েছিলি নাকি?

হ্যাঁ, বাবা বরফ চাইছে। দিয়ে আসি।

সুবালাকে বল না, দেবে।

না, আমিই দিই। আর শোনো মা, ঝুমাকে কিন্তু ছাদেও দেখলাম না।

একটু আগে তো পেছনের বাগানে ঘুরছিল। মাঝখানে একবার ঘরে এসেছিল। আবার বেরিয়ে গেল। আছে কোথাও আশেপাশে।

থাকলে আসছে না কেন ঘরে? কতকাল পরে আমি এলাম।

বললাম না, রাগ হয়েছে।

ওকে বড্ড বকো তুমি। অবুটাও ওই মেয়েটাকে স্কুটারে নিয়ে যে কোথায় হাওয়া হলো। বাড়িতে কোনো ডিসিপ্লিনই নেই তোমাদের।

মেয়েটাকে পৌঁছে দিতে গেছে। আসবে এখনই।

কত দূরে গেল?

মেয়েটার বাড়ি তো শুনেছি পাইকপাড়ায়।

ওর মেয়ে-বন্ধুর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে মা। আমার ছেলে-বন্ধু কিন্তু তুমি কোনোদিন অ্যালাউ করোনি। ওকে অত আস্কারা দিচ্ছো কেন? হুটহাট মেয়েদের বাড়ি নিয়ে আসে কেন? বাইরে যা খুশি করুক, বাড়িতে কেন?

কী করব বল। বড় হয়েছে।

সাবধান না হলে একদিন দেখবে একটা গেছো মেয়েকে বিয়ে করে এনে তুলবে।

কপালে থাকলে তাই হবে। কিছু করার নেই।

কী যে খারাপ লাগছে। বাড়িতে এলাম অথচ ঝুমা নেই, অবু নিপাত্তা··· কী যে ভূতের বাড়ি করে রেখেছো তোমরা।

বলতে বলতে নেমে গেল বুলা। ফ্রিজ খুলে বরফের ট্রে বের করল। বোল-এ বরফ ভরে নিয়ে ছাদে উঠে এলো।

বাবা, বরফ।

সুবীর সাড়া দিলো না। তাকে এখন ভূতে পেয়েছে। প্রায়ই পায়। এক এক সময়ে সে এক একটা অদ্ভুত বায়বীয়, কুয়াশাচ্ছন্ন, অস্পষ্ট এবং অদ্ভুত আকার দেখতে পায়। যেমন এখন সে দেখছে, আকাশের চাঁদ থেকে খুব পেটমোটা একটা মূর্তি নেমে এলো সাঁতার দিয়ে। লিকলিকে হাত পা, পেট আর বুক যেন একটা বড় ফুটবল, মাথাটা একটা ছোটো ফুটবল। একটার ওপর আর একটা খুব আলতোভাবে বসানো।

নতুন বাড়িতে ভূত থাকাটা কোনো কাজের কথা নয়। সুবীর তাই হাত নেড়ে বলল, যাঃ হ্যাট। এখানে সুবিধে হবে না।

জোড়া ফুটবল ছাদে ডন দিতে দিতে বলল, খুব হবে, খুব হবে। কার জমিতে ঘর তুলেছো হে।

সুবীর একটু ভয় পেল। কার জমি তা সে জানে না। মনেও পড়ল না। তাই সে চুপ করে ভাবতে লাগল, জমিটা কি তবে তার নয়? যার, সে কি ফের কেড়ে নেবে?

সুবীর শুনতে পেল, বাড়ির সামনে দিয়ে বরফওলা হেঁকে যাচ্ছে, কুলপি বরফ···কাঠি বরফ···

সুবীরের পরনে হাফ প্যান্ট ন-বছর বয়স। ছাদের ওপর থেকেই সে ডাকল এই বরফওলা।

বরফওয়ালা মুখ তুলে তাকাতেই চিনতে পারল সুবীর। ফটিক। গালে রুখু দাড়ি, চোখদুটো বসা। একসঙ্গে পড়েছে তারা। অথচ তার পরনে হাফ প্যান্ট, বয়স মোটে ন বছর, তাহলে ফটিক একদম বুড়ো হয়ে গেল কি করে?

ছাদ থেকেই হাত বাড়াল সুবীর। আশ্চর্যের বিষয় তার হাত লম্বা হয়ে নেমে একদম রাস্তায় পৌছে গেল। ফটিক খুব অনিচ্ছের সঙ্গে একটা কাঠি বরফ বের করে দিলো।

বরফ···বরফ···

সুবীর একটু কষ্টেই চোখ মেলল, কে রে?

আমি বাবা, আমি বুলা।

সুবীর প্রথমটায় চিনতে পারল না। নামটি চেনা চেনা···অথচ···ওঃ বুলা।

তোরা এসে গেছিস?

কখন। তুমি যে একটু আগে বরফ চাইলে আমার কাছে।

তোর কাছে। হবে।

গেলাসে দেবো বরফ?

দে।

আর কত খাবে বাবা? তোমার বেশ নেশা হয়েছে কিন্তু।

না খেলে যে ঘুমই হবে না।

আজ আর খেও না। তোমার জামাই কী ভাববে বলো তো?

সুমন্ত্র খায় না বুঝি?

একটু আধটু। পার্টি-টার্টি থাকলে

আমিও একটুই খাবো। আর একটা বড়। ঢালবি?

ঢালছি।

তুই তো কম করে দিবি। দে আমি ঢালি।

বুলা বোতলটা ওপরে তুলে দেখে নিয়ে বলল, বেশি তো নেইও।

বলিস কি ? বাইশ আউন্সের বোতল। এত তো খাই নি।

খেয়েছো নইলে খাবেটা কে ?

বেড়াল ফেলে দেয় নি তো।

না। বোতল খাড়া ছিল। পড়ে নি।

যাঃ বাবা, আজকাল তাহলে মদেও নেশা হচ্ছে না তেমন। শেষে কি ড্রাগ ফাগ ধরতে হবে ?

তা কেন বাবা ? নেশা করতেই হবে কেন ? আজকাল সবাই কেন এত, নেশা করে বলো তো ?

ঘ্রাউ করে মস্ত একটা উদ্‌গার তুলল সুবীর। তারপর কাতর স্বরে বলল, ওঃ নেশা করি বলেই বেঁচে আছি। আজকাল নেশা কি আর ধরতে চায় ? দেখ না, বোতল প্রায় খালি, তবু ঠিকমতো নেশাটা হয়নি। কেন হলো না বলতো।

বুলা অত্যন্ত আহত গলায় বলল, বাবা, আমাদের বাড়িটার কী হলো বল তো! তোমরা যে কেউ ঠিক নেই। তুমি নেশা করছ, অবু বান্ধবীদের এনে তোমাদের নাকের ডগায় যা-খুশি করছে, ঝুমা এত রাত অবধি বাইরে, আর মা···

সুবীর ক্যাবলার মতো খানিকক্ষণ সামনের দিকে চেয়ে থেকে বলল, আমাকে বকে লাভ নেই। আমি এ বাড়ির কেউ নই। বোঝাপড়া করতে হলে তোর মার সঙ্গে করগে যা। বরফটা গেলাসে দিয়ে বোতলের তলানিটুকু ঢেলে দে তো।

তুমি ওটুকুও খেও না। জামাই বসে আছে তোমার জন্য। আমাদের খিদে পেয়েছে। নাতিটাকে তো একটু কোলেও নিলে না নিচে গিয়ে। চলো বাবা।

যাচ্ছি। শোন, এ বাড়িতে যা যা সব হয় তার জন্য আমাকে দায়ী করিস কেন? আমি তো জোগানদার, আর কিছু তো নই। কোম্পানীতে যেমন সাপ্লায়াররা থাকে, তারা বাইরের লোক, চাহিদামতো জোগান দেয় মাত্র, ম্যানেজমেন্টে তো তাদের ভূমিকা নেই। তোর মা আর ভাই মিলে আমাকে একরকম টপ্‌ল করে দিয়েছে। আমার ভোটের কোনো দাম নেই।

সেটা জানি। তোমারও দোষ আছে বাবা। তুমি কেন মায়ের গায়ে হাত তুলেছিলে?

সুবীর তলানি হুইস্কিটুকু গেলাসে ঢেলে উত্তেজিত কাঁপা হাতে একটা চুমুক দিয়ে বলল, পুরোনো কথা তুললে আমি একটু অ্যাজিটেটেড হয়ে পড়ি। দেখ, আমার হাত কাঁপছে। নার্ভ ঠিক নেই। আজকাল আমি বাড়িতে রাতটা কোনোরকমে কাটাই। আর কোনো সম্পর্ক রাখি না।

খুব খারাপ করো বাবা। সংসারে যদি পুরুষমানুষের কোনো ভূমিকা না থাকে তবে তাতে ভালো হয় না। আমাদেরও হচ্ছে না। আর তুমিও কেমন যেন বিচ্ছিরি হয়ে গেছ। আগে কত স্মার্ট, কত অ্যাজাইল ছিলে। আজকাল কি তাড়াতাড়ি বুড়ো হওয়ার চেষ্টা করছ?

সুবীর দু হাতে গেলাসটা ধরে একটু ঝুঁকে উল্টোদিকের বাড়িটার একটা জানলার দিকে চেয়ে ছিল। একটা বাহারী লতা জানলার ধার ঘেঁষে ছাদে উঠে যাচ্ছে। কী উচ্চাশা, ওপরে ওঠবার, ছড়িয়ে পড়বার কী দুর্দম নেশা!

বাবা, চলো।

সুবীর কথাটা কানে তুলল না। আপনমনে বলল, তোর মাকে যে একটা লোক মাঝে মাঝে ফোন করে তা জানিস?

জানি, জানব না কেন?

অনেকক্ষণ ধরে কথা বলে।

তাও জানি।

লোকটাকে আমার একটুও হিংসে হয় না, তোর মায়ের ওপরেও রাগ হয়

না। শুধু করুণা হয়।

তোমার তাও হয় না বাবা। তুমি একদম পাথর হয়ে গেছ।

সুবীর ঠাণ্ডা হুইস্কিটা ঢক করে গলা দিয়ে নামিয়ে দিলো। তারপর চিৎপাত হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে বলল, মেঘ করেছে, না রে?

হ্যাঁ। বৃষ্টি এলো বলে।

বড্ড গরম। বৃষ্টিটা হলে বেশ হয়।

তোমাকে মশা কামড়ায় না বাবা?

খুব কামড়ায়, ভীষণ কামড়ায়। তবে আজকাল আর বিশেষ টের পাই না। সয়ে গেছে।

না বাবা; তুমি ভোঁতা হয়ে যাচ্ছো। এখানে তো দু মিনিটও দাঁড়ানো যায় না, এখন, এত মশা। ঘরে তবু একটু কম। সন্ধেবেলা স্প্রে করেছিল বোধহয়।

ঘরেও কামড়ায়।

আচ্ছা, তোমাদের কি কারও ঝুমার জন্য কোনো চিন্তা নেই বাবা? এত রাত অবধি মেয়েটা বাইরে কেন থাকবে? আমি আসছি জেনেও বাইরে থাকার মেয়ে তো সে নয়।

আমি ওসব খবর রাখি না। সন্ধেবেলা শুনছিলাম ওর মা ওকে খুব বকেছে আনপার্লামেণ্টারি সব ভাষায়। আমি শাওয়ার খুলে শব্দগুলো না শোনবার চেষ্টা করছিলাম। মাগী টাগীও বোধহয় বলছিল। আজকালকার মেয়েরা ওসব ইতর ভাষা ব্যবহার করে বলেও জানা ছিল না।

বকছিল? তাই কি রাগ করে কোথাও লুকিয়ে আছে?

হতে পারে।

কিন্তু আমি তো সব জায়গা খুঁজে এলাম। কোথাও নেই।

পেছনের বাগানটা দেখ তো। অনেক সময়ে ওখানে থাকে। টর্চ নিয়ে যাস। সাপ আছে। চার পাঁচ দিন আগেই একটা গোখরো বেরিয়েছিল।

মা বলছিল কাছেপিঠে কোথাও গেছে।

হতে পারে। কত রাত হয়েছে?

এগারোটা বেজে গেছে। নাঃ, তোমাদের দিয়ে কিছু হবে না। আমি দেখছি।

এই বলে বুলা নেমে এলো ছাদ থেকে। টর্চ নিয়ে পেছনের বাগানটা চক্কর মেরে দেখে এলো। কোথাও ঝুমা নেই। অথচ বাবা দিব্যি ছাদে বসে মদ খাচ্ছে। মেজেনাইন ফ্লোরের ঘরে শাশুড়ি আর জামাই কথা বলছে। অবু এখনো বান্ধবীকে পৌঁছে দিয়ে ফেরে নি। বাচ্চা চাকরটা বাইরের ঘরে সোফার কাছে মেঝেয় ঘুমোচ্ছে। সুবালা বাসন-টাসন কিছু একটা ধুচ্ছে রান্নাঘরে।

বুলার এত খারাপ লাগছিল। ঝুমার ঘরটা আবার দেখল সে। টেবিলের ওপর একটা খোলা খাতা। পাতা উড়ছে। তারই একটা পাতায় লেখা, যাই। কথাটা মেটেই ভালো লাগল না বুলার। 'যাই' মানে কী? এ কি সুই-সাইডাল নোট?

ফোনটা বাজতেই বুলার বুকটা ধক্ করে উঠল। এত রাতে ফোন করে কে? অবু? ঝুমা?

সে গিয়ে ধরল, হ্যাল্লো।

একটা পুরুষ কণ্ঠের হাঁফধরা শব্দ পাওয়া গেল, কে, অর্চনা?

কী চাই, বলুন তো?

জানতে চাই, এটা অর্চনার বাড়ি কি না, নাকি রং নাম্বার।

অর্চনারই বাড়ি। তবে মা এখন কাছাকাছি নেই।

আপনি কি বুলা?

হ্যাঁ। আপনি কে?

আমি যে-ই হই, আপনার বোন ঝুমাকে কয়েকটা অবাঙালী ছোকরা গাড়ি করে এ বি ব্লকের দিকে নিয়ে গেছে। ওদিকটা ভীষণ ফাঁকা।

কোথায় নিয়ে গেছে? বলে চিৎকার করে উঠল বুলা।

শুনুন, ঘটনাটা বেশিক্ষণ আগে ঘটে নি। আমাদের বাড়ির সামনে দিয়েই

ঝুমা যাচ্ছিল। দেখে মনে হচ্ছিল ইনটক্সিকেটেড। পা টলছিল। আমি ওই অবস্থা দেখে পিছু নিয়েছিলাম ওর।

তারপর কী হলো?

একটা গাড়িকে ও হাত দেখিয়ে থামানোর চেষ্টা করে। সেটা থামে নি, কিন্তু ওরা নজর রেখেছিল। ফের ঘুরে এসে ওকে তুলে নেয়।

ঝুমা ইনটক্সিকেটেড ছিল একথা আপনাকে কে বলেছে?

আমি দেখেছি ও টলছিল। ভালো করে হাঁটতে পারছিল না। মাতালরা যেমন হাঁটে তেমনি এলোমেলো পা ফেলছিল।

আপনার নাম কী বলুন তো! কোথায় থাকেন?

ওটা বলা যাবে না।

আমার মাকে কি আপনি চেনেন? প্রথমে তো মায়ের নামই করেছিলেন! আমি চিনি। কিন্তু অর্চনা আমাকে চেনে না। কিন্তু আপনি অনর্থক সময় নষ্ট করছেন। কয়েক মিনিটের হেরফেরে কত কী হয়ে যেতে পারে। সিচুয়েশনের গুরুত্বটা বুঝে আপনারা কিছু করুন। গাড়ির নাম্বারটা বলছি, টুকে নিন।

লোকটা শেষদিকে বেশ বিরক্তির সঙ্গে কথাগুলো বলে ফোনটা রেখে দিলো।

বুলা যতক্ষণ কথা বলছিল ততক্ষণ ঘটনাটা কতখানি গুরুতর তা বুঝতে পারেনি। এখন তার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে উঠল। হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে এলো। সে আর্ত একটা চিৎকার দিলো, মা! মা! শুনছো?

দরজা খোলা ছিল। তার আর্ত চিৎকার ওপরের ঘরে শুনতে পেল অর্চনা। সাড়া দিলো, কী রে, কী হয়েছে?

শিগগির এসো। ঝুমাকে কারা যেন ধরে নিয়ে গেছে।

অর্চনা নেমে এলো তাড়াতাড়ি। এলো সুবালা। একটু সময় নিয়ে সুমন্ত্র। বুলা কাউকেই কিছু বলল না। দ্রুত হাতে সে থানার নম্বর ডায়াল করল। তিনবারের চেষ্টায় লাইন পেল।

হ্যালো থানা ? প্লীজ, আপনারা শিগগির আসুন, আমার বোনকে কয়েকজন ছোকরা ধরে নিয়ে গেছে। আমাদের ঠিকানাটা নিয়ে নিন···

একটা গম্ভীর গলা বলল, সুবীর বসুর বাড়ি থেকে ফোন করছেন কি ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ···

একটু আগেই আর একজন ফোন করে আমাদের খবরটা দিয়েছে। আপনার বোনের নাম ঝুমা তো !

হ্যাঁ, হ্যাঁ···

আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই যাচ্ছি।

প্লীজ, দেরী করবেন না। এখন প্রত্যেকটা মিনিটই ভাইট্যাল।

আমাদের জীপটা একটু বাইরে গেছে। ওয়েট করছি। জীপ এলেই আমরা বেরোচ্ছি।

মাই গড ! জীপ কখন আসবে ?

এখুনি এসে পড়বে।

আপনারা ট্যাকসি করে আসুন, আমরা ভাড়া দিয়ে দেবো। প্লীজ, আর এক মিনিটও দেরী করবেন না।

হ্যাঁ, ঠিক আছে। আমরা দশ পনেরো মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যাবো। আমি ঘড়ি দেখছি কিন্তু।

ফোনটা রেখেই বুলা তার মায়ের দিকে তাকাল।

ঝুমা নাকি মদ খেয়েছে, তুমি কিছু জানো ?

অর্চনা আকাশ থেকে পড়ে বলল, মদ খেয়েছে ? কে বলল তোকে ?

তোমার সেই—বলতে গিয়েও থেমে গেল বুলা। তারপর বলল, একজন অচেনা লোক। সে-ই ফোনে খবরটা দিয়েছে।

কারা ওকে ধরে নিয়ে গেছে ?

কী করে বলব ? ঝুমা নাকি নিজেই গাড়িটাকে থামানোর চেষ্টা করেছিল। কয়েকজন ওকে তুলে নিয়েছে।

অর্চনার মুখেচোখে দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগ ফুটে উঠল বটে, কিন্তু সে বেশ

ঠাণ্ডা গলাতেই বলল, তোর বাবাকে ডেকে আন।

বুলা হতাশ গলায় বলল, বাবা! বাবা কী করবে?

কী করবে তা তাকেই বুঝতে দে। যা, ডেকে আন। এটা তো মদ খেয়ে ফুর্তি করার সময় নয়।

বুলা সিঁড়ি বেয়ে একরকম দৌড়ে ছাদে উঠল।

বাবা!

কী রে?

শিগগির ওঠো। ঝুমাকে কারা যেন ধরে নিয়ে গেছে।

সুবীরের নেশাটা তেমন জমে নি আজ। মেজাজটা এমনিতেই সব সময়ে খিঁচড়ে থাকে। আজ আরও বেশী। মাথার ভেতরটা যদি সাঁতার না কাটে, যদি না ঘুলিয়ে যায় বাস্তবতা, যদি না দেখা দেয় অদ্ভুত সব ভূতেরা তাহলে এত পয়সার মদ গিলে কী লাভ?

সুবীর কিছুক্ষণ—কয়েক সেকেণ্ড চেয়ে রইল বুলার দিকে, কী হয়েছে বললি? ঝুমাকে কারা ধরে নিয়ে গেছে?

ওঠো বাবা, এত কথা বলার সময় নেই। এ বি ব্লকের দিকে গেছে। এক্ষুনি আমাদের কিছু করা দরকার।

সুবীর যথাসাধ্য তাড়াতাড়ি ওঠবার চেষ্টা করল। বুকের ভেতরটা হঠাৎ কেন যে এত নড়ছে! মাথাটা ঘুরপাক খেল। তবু দাঁড়াল সুবীর। বেশ ভেজা ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে এখন। আর সেই হাওয়ায় সারা আকাশময় চলে এল কালো মেঘ। চমকে চমকে উঠছে বিদ্যুৎ।

সুবীর যখন সিঁড়ির ঘরের দরজায় তখন বৃষ্টিটা নামল।

৭

ট্যাক্সিটা মাঝখানে একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ড্রাইভার বনেট খুলে সেটা সারাতে একটু সময় নিল। তারপর চলল।

এসব জায়গা কী ছিল আর কী হয়েছে দেখেছিস? সঞ্জয় বলল।

দেখছি।

ফ্যান্টাস্টিক না? আরকিটেকচারাল এক্সপেরিমেন্ট সব এসে জুটল সল্ট লেক-এ। আমার কাকা যখন সল্ট লেক-এ লরি লরি মাটি ফেলার কন্ট্রাক্ট পেয়েছিল তখন প্রায়ই আসতাম। বিশ্বাস হয় নি যে জায়গাটা এরকম দারুণ হবে।

শৌনক একটু হাসল। বলল, জায়গাটার টারগেট ছিল বাঙালীর জন্য পুনর্বাসন। এখন মাড়োয়ারিরা দুনো দামে কিনে নিচ্ছে।

চিড়িয়াটা কে রে?

কোন্ চিড়িয়া?

ওই যে বুলা। তোর সঙ্গে কিছু ছিল?

একটু আধটু ছিল। হবনবিং। নাথিং সিরিয়াস।

দেখতে ভালো কিন্তু। বরটা একটু ন্যাদস মার্কা।

ওরকমই হয়। এদেশে ম্যাচমেকিং বলে কিছু নেই। বরটা যদি ভালো হলো তো বউটার দিকে তাকানো যায় না। বউটা যদি সুন্দর তো বরটা পিপে। কোনো স্ট্যাণ্ডার্ড নেই।

তবে বুলার মা কিন্তু হেভি সুন্দর। এখনো যা আছে—

খেলোয়াড় মেয়েছেলে। চোখ ফোক দেখেছিস! কটাক্ষ আর কাকে বলে!

রেলাও খুব। বুলার কাছে শুনেছি খুব প্যার্সোন্যালিটি আছে। আরে! ওটা কে রে রাস্তার মাঝখানে হাত দেখাচ্ছে! এই ড্রাইভার, রোখকে…

ড্রাইভার গাড়ি থামাল না। বরং অ্যাকসেলেটর চেপে বোঁ করে গাড়িটা এগিয়ে নিতে নিতে বলল, দাদা, অনেক রাত হয়েছে। এসব জায়গা রাতের দিকে ভালো নয়।

শৌনক আর সঞ্জয় দুজনেই ঘাড় ঘুরিয়ে অন্ধকার রাস্তায় চেয়ে দেখল। লোকটাকে দেখা গেল না।

সঞ্জয় একটা ধমক দিয়ে বলল, গাড়িটা ঘোরান তো! লোকটা কিছু একটা চেঁচিয়ে বলছিল।

রিস্ক নেবেন না দাদা। ঝঞ্ঝাটে পড়ে যাবেন।

শৌনক ঠাণ্ডা গলায় বলল, আমরা ঝঞ্ঝাটই পছন্দ করি। গাড়ি ঘোরান। অনেক ঘাটের জল খেয়ে এসেছি, আমাদের কিছু হবে না।

লোকটা অগত্যা গাড়িটা ঘুরিয়ে নিল।

একটু জোরে চলুন। লোকটা হয়তো এতক্ষণে রাস্তা বদলে ফেলেছে।

সঞ্জয় একটু জোরে বলে উঠল, না না, ওই তো!

একজন যুবক রাস্তা ধরে দৌড়ে আসছিল। হেড লাইটের আলো পড়তেই ফের হাত তুলে চেঁচাল। বেঁধে দাদা, ভীষণ বিপদ। একটু হেলপ করুন।

শৌনক গলা বার করে বলল, কী হয়েছে?

একটা মেয়েকে কয়েকটা ছেলে একটা অ্যামবাসাডারে তুলে নিয়ে গেছে ওই দিকে। গাড়ির নম্বর ডবলিউ বি সি ওয়ান থ্রি…

আপনি গাড়িতে উঠুন। চলুন দেখছি।

ছেলেটা জানলার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, যেতে পারি। কিন্তু মেয়েটার বাড়িতে একটা ফোন করে খবরটা আগে দেওয়া দরকার। কিন্তু ফোন করতে গেলে দেরী হয়ে যাবে। ওরা বেশীদূর যায় নি। ডানদিকে ওই এ বি ব্লকে ঢুকলে সামনে একটা পার্ক আছে। আমার ধারণা ওখানে নিয়ে গেছে। প্লীজ, আপনারা একটু হেল্‌প করুন।

সঞ্জয় একটু চটে গিয়ে বলে, বাঃ মশাই, আমরা সীতা উদ্ধার করব আর আপনি ফোন করার নাম করে কেটে পড়বেন, তাই হয় নাকি ?

ছেলেটা অসহায়ভাবে বলল, তাহলে প্লীজ একটু অপেক্ষা করুন। আমি দেখছি, সামনে এক ডাক্তারের বাড়ি আছে যদি ফোন করতে পারি। একটু ওয়েট করবেন তো !

শৌনক ভরাট গলায় বলল, করছি। পালাব না। যান।

ছেলেটা দৌড়ে চলে গেল।

ড্রইভার একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, ঝঞ্ঝাট পাকিয়ে ফেললেন স্যার। আমার গ্যারেজ কোথায় জানেন ? সেই বৈষ্ণবঘাটা।

সঞ্জয় বলল, আমরা তো সাউথেই যাবো, বলেইছি। মিটার উঠছে।

সে তো বুঝলাম। হাঙ্গামায় পড়ে গেলে তো রাতও কাবার হয়ে যেতে পারে।

শৌনক ঠাণ্ডা গলায় বলল, হলে হবে। আপনিও তো মানুষ। কেউ বিপদে পড়লে মানুষকেই এগোতে হয়।

ড্রাইভারটা আর কথা বলল না। চুপচাপ সিগারেট টেনে যেতে লাগল। সঞ্জয় নেমে দাঁড়িয়ে চারদিকটা দেখে নিল, তারপর আড়মোড়া ভেঙে বলল, শৌনক, লোকটা গেল কোথায় রে ?

ওই লাল বাড়িটায় ঢুকেছে। আমি নজর রাখছি।

এ পাড়ার লোকগুলো কি খুব আরলি শুয়ে পড়ে ? বেশীর ভাগ বাড়িই অন্ধকার দেখেছিস ?

নির্জন জায়গায় বোধহয় তাড়াতাড়ি ঘুম পায়। পাহাড়ে আমাদেরও পেত। মনে আছে অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্পে তিন দিন আমরা কিরকম সন্ধে হতে না হতেই ওই শীতেও ঘুমিয়ে পড়তাম ! শিখু সিং ঘুম থেকে তুলে গরম খিচুড়ি খাওয়াত।

সঞ্জয় গাড়ির দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, মাইরি কী কপাল বল তো ! এতদিন পাহাড় পর্বত ভেঙে বাড়িতে ফিরছি, কোথায় গিয়ে এখন

গরম ভাত খেয়ে বিছানায় শুয়ে টানা আঠারো ঘণ্টাই ঘুমোবো, না জুটল এসে নারীহরণ।

লাগেজ বুটটা খুলে তোর চপারটা বের কর।

কী হবে?

যদি ওরা আর্মড হয়ে থাকে!

আরে না, ফুর্তিবাজ ছেলেছোকরাই হবে। এমন হাঁক মরব যে পালাবে।

ড্রাইভার হঠাৎ পেছনে তাকিয়ে বলল, স্যার, আপনারা খুব পাহাড়ে চড়েন, না?

জবাবটা দিলো শৌনক, হ্যাঁ।

সেইজন্যেই বেশ কারেজ আছে আপনাদের। অন্য সব সওয়ারী হলে পালাত।

হ্যাঁ, আমরা একটু অন্যরকম। হাঙ্গামা পছন্দ করি।

সে স্যার আমিও করি। নইলে গাড়ি না ঘুরিয়ে সোজা সল্ট লেক পার হয়ে যেতাম।

তাই তো যাচ্ছিলেন।

ড্রাইভার একটু নরম গলায় বলল, সেটা হাঙ্গামার ভয়ে নয় স্যার আমার একটা মাত্র মেয়ে। ছোট্ট। সে খুব জ্বরে ভুগছে। সকালে একশ চার দেখে এসেছি। মনটা ভালো নেই।

এ কথায় সঞ্জয় আর শৌনক একটু মুখ চাওয়া চাওয়ি করে নিল।

সঞ্জয় বলল, ঠিক আছে, মিটারের ওপর কিছু দিয়ে দেবো।

তার দরকার নেই। আমি আপনাদের সঙ্গেই আছি।

এরপর তিনজন একটু চুপচাপ হয়ে গেল।

লালবাড়ির দরজা খুলে ছেলেটা বেরিয়ে এল। পেছনে একজন মহিলা আর একজন পুরুষ।

মহিলাটি ছেলেটিকে উদ্দেশ্য করে সামান্য উঁচু গলায় বললেন, খুব চিন্তায় থাকব। মেয়েটার কী হলো কাল একবার জানিয়ে যাবেন কিন্তু।

ছেলেটা ট্যাক্সির দিকে আসতে আসতে বলল, ঠিক আছে।

ছেলেটা এখনো হাঁফাচ্ছে। সামনের দরজাটা খুলে ড্রাইভারের পাশে বসে পড়ে বলল, চলুন। আমি পথ দেখাচ্ছি।

সঞ্জয় পিছন থেকে ছেলেটার কাঁধে হাত রাখল, মেয়েটা আপনার কে হয় বলুন তো!

ছেলেটা এ কথার চটজলদি জবাব দিলো না। কেন দিলো না কে জানে। সামান্য একটু সময় নিয়ে বলল, কে আর হবে পাড়ার মেয়ে। চিনি।

কেমন মেয়ে?

ভালোই। কেন বলুন তো!

কলকাতায় সল্ট লেক-এর মতো পাড়া থেকে একটা মেয়েকে তুলে নিয়ে যাওয়াটা খুব সাধারণ ব্যাপার নয় কিনা। ইন ফ্যাকট কলকাতা শহরেই এরকম ঘটনা খুব কম ঘটে।

ছেলেটা মাথা নেড়ে বলল, তা ঠিক।

তাহলে কেসটা কী?

ছেলেটা ফের একটু সময় নিয়ে বলল, মেয়েটা, যতদূর জানি, ভালো। কিন্তু আজ মেয়েটা খুব স্বাভাবিক ছিল না।

কিরকম ছিল?

মনে হচ্ছিল ইনটক্সিকেটেড।

মালটাল টানে নাকি?

সেরকম কথা তো নয়।

তাহলে মেয়েটা ভালো বলে সার্টিফিকেট দিচ্ছেন কেন? মাল টানে রাত-বিরেতে বাড়ি থেকে বেরোয়।

শৌনক এতক্ষণ কথা বলে নি। এবার বলল, মেয়েটা কি একা ছিল? নাকি আপনি ওর সঙ্গে ছিলেন?

ছেলেটা মাথা নেড়ে বলল, আমি সঙ্গে থাকব কেন? আর থাকলে ওকে কি তুলে নেওয়া সহজ হত?

কিভাবে নিল জোর করে ?

ছেলেটা আবার সময় নিয়ে বলল, না। ঝুমা নিজেই লিফট চাইছিল।

ঝুমা ! নামটা চেনা-চেনা ঠেকছে। কার মেয়ে বলুন তো ?

ওর বাবার নাম সুবীর বোস।

সুবীর বোস ? লে হালুয়া, এ কি বুলার সেই বোনটা নাকি ?

সঞ্জয় মাথা নেড়ে বলল, ওরা খুব ঝুমা ঝুমা করছিল বটে। কিন্তু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না।

শৌনক প্রায় চিৎকার করে বলল, মাই গড !

সঞ্জয় ছেলেটার ঘাড়ে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, আপনার নাম কী ?

নাম নিয়ে কী হবে ?

খুব খারাপ নাম নাকি ? গজানন ফজানন নয় তো !

না। আমার নাম জন্মেজয় দত্ত।

ঠিকানা ? ব্লক বি বি, ছেষট্টি। এইবার ডান দিকে।

ট্যাক্সি ডানদিকে মোড় নিতেই বোঝা গেল, এদিকটায় বসতি একদম গড়ে ওঠে নি। এমন কি রাস্তাটাও ভালো নয়। রাস্তার মাঝখানে ঘাস উঠেছে। দু ধারে অন্ধকার খালি প্লট।

জন্মেজয় বলল, আর একটু এগোলেই পার্ক।

শৌনক গাড়ির হ্যাণ্ডেল ধরেই বসে ছিল। গাড়ির হেডলাইটে দেখা গেল সামনে পার্ক নয়, একটা প্রায়-জঙ্গল। আসলে প্রস্তাবিত পার্ক। এখন শুধু দেয়াল দিয়ে ঘেরা অনেকটা জমি। প্রচুর আগাছা আর বড় গাছের ভীড়।

তিনজন তিনটে দরজা দিয়ে ছিটকে নামল। শৌনক চেঁচিয়ে ড্রাইভারকে বলল, হেডলাইটটা জ্বালিয়ে রাখুন।

সঞ্জয় বলল, কিন্তু গাড়িটা কোথায় ?

জন্মেজয় বাঁ দিকে দৌড়োতে দৌড়োতে বলল, ওইদিকে একটা কিছু দেখা যাচ্ছে। আসুন।

তিনজনেই প্রায় সমান্তরাল ছুটল। জন্মেজয় একটু আগে।

পঞ্চাশ গজ এগোতেই দেখা গেল, পার্কের দেয়াল ঘেঁষে অন্ধকারে পরিত্যক্ত অ্যাম্বসাডারটা নিঃঝুম দাঁড়িয়ে। দরজা লক করা।

কী হচ্ছে কী দাদা ? এসব কী ? এ আমাদের ফ্রেণ্ড আছে। গার্ল ফ্রেণ্ড।

সঞ্জয় ছেলেটার গালে একটা চড় মারল। এত জোরে যে, একটা পটকা ফাটার মতো শব্দ হলো। বলল, শুয়োরের বাচ্চা, তোমার গার্ল ফ্রেণ্ড ! চল শালা থানায়, গার্ল ফ্রেণ্ড দেখাচ্ছি।

ছেলেগুলো ভেড়ুয়াই হবে। হঠাৎ চারজন যুবক অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যে হুড়মুড় করে নেমে ছুটে পালাতে লাগল।

৮

শ্বশুরবাড়িতে জামাইষষ্ঠীর নেমন্তন্ন খেতে এই যে পথটা পার হতে হয়েছে, পোয়াতে হয়েছে বিবিধ ঝঞ্ঝাট, অ্যাটাচি হারিয়েছে, পুলিশের কাছে যেতে হয়েছে এতেও দিনের গর্দিশ শেষ হয় নি। শ্বশুরবাড়ির নিরাপদ আশ্রয়ে নির্ঝঞ্ঝাট রাতটা কাটাবে তেমন কপাল কি সুমন্ত্রর ? কোথাও কিছু না, স্রেফ তাকে হয়রান করার জন্যই শালীটা গায়েব হলো।

শ্বশুরের পা টলছে, শালা বেপাত্তা, চোরদায়ে ধরা পড়ল সুমন্ত্র।

ওগো, তুমি কী করছো ? একটা ছাতা আর টর্চ নিয়ে বেরোতে পারছ না ? এ বি ব্লক, ওদিকটায় একটা পার্ক আছে। যাও না···

সুমন্ত্র জলে-ডোবা মানুষের মতো চারদিকে চাইল। কোনো উপায় নেই। পেট চুঁই চুঁই করছে খিদেয়, বিছানা তাকে চুম্বকের মতো টানছে। আর বাইরে এখন চলছে দামাল হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি।

সুমন্ত্র অনিচ্ছুক হাতটা বাড়াল। দু হাতই। ছাতা আর টর্চ তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বুলা বলল, মারপিট করতে যেও না। বিপদ দেখলে চেঁচিও। সুমন্ত্রকে একথাটা বলার মানেই হয় না। জীবনে সে কখনো মারপিট করেনি। সেটা বুলাও জানে। কথাটা কমপ্লিমেন্ট হিসেবেও নেওয়া যায়। অন্তত বুলার তো ভয় আছে যে, সুমন্ত্র মারপিট করলেও করতে পারে!

সদর খুলে বেরোতেই দুর্যোগময়ী রাত্রি যেন ডাকনীর মতো অট্টহাসি হেসে উঠল। আয় রে ন্যালাভোলা খ্যাপা ছেলে তোকে নিয়ে মজা করি। সঞ্জয় নিচু হয়ে সামনের ডানদিকের চাকার হওয়া খুলে দিতে লাগল। বলল, যাতে পালাতে না পারে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তোরা দেখ। দেখলে

হাঁক মারিস।

জন্মেজয় আর শৌনক নিচু পাঁচিলটা ডিঙিয়ে পার্কে ঢুকল।

অন্ধকার বেশ ঘন। তার ওপর হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হলো গাছপালায় মোহময় শব্দ তুলে!

জন্মেজয় উত্তেজিত গলায় বলল, ঝুমার নাম ধরে চেঁচাবো?

শৌনক হাত তুলে বলল, বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ওরা নিশ্চয়ই শেলটার নিতে গাড়ির দিকেই আসবে।

সেটা তো অনুমান। যদি না আসে? চেঁচালে উই হ্যাভ নাথিং টু লুজ।

জন্মেজয়কে চেঁচাতে হলো না। চেঁচাল ঝুমাই। পার্কের ভেতরে কংক্রিটের একটা গোল ঘর তৈরি হবে বলে ঢালাই হয়ে পড়ে আছে কিছুদিন। দেয়াল নেই, শুধুই ছাদ আর মেঝে। সেদিক থেকেই হঠাৎ ঝুমার চিৎকার ভেসে এলো, মেঘের পরে মেঘ জমেছে···

সম্পূর্ণ বেসুরো বেতালা গলায় গান গেয়ে উঠল ঝুমা। তারপর খিলখিল করে হেসে কুটিপাটি হতে লাগল।

জন্মেজয় অন্ধকারেই শৌনকের দিকে তাকাল, ওই তো!

শৌনক মাথা নেড়ে বলে, কিন্তু এ তো আর্ত চিৎকার নয়। মনে হচ্ছে ফুর্তিতেই আছে। চলুন, দেখি।

সঞ্জয় দেয়ালটা টপকে নেমে পড়েছে পার্কে। বলল, কী হচ্ছে রে ওখানে? মাইফেল নাকি?

জন্মেজয় খুব দৃঢ় স্বরে বলল, মেয়েটা ওরকম নয়। কেন মদ খেল, কেন অচেনা কিছু ছোকরার সঙ্গে গাড়িতে উঠে চলে এল সেটা বুঝতেই পারছি না।

শৌনক গম্ভীর হয়ে বলল, এনিওয়ে, মেয়েটাকে তার বাড়িতে পৌঁছে দিতে হবে।

সঞ্জয় বলল, কেসটা অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স শুরু? এ তো রেপ কেস নয়।

তাই তো মনে হচ্ছে। চল দেখা যাক। শার্প কিচ্ছু করার দরকার নেই।

মেয়েটা তো উইলিং বলেই মনে হচ্ছে।

জঙ্গলে বৃষ্টিপাতের একটা গহীন রহস্যময় শব্দ উঠছিল। চার যুবক ও এক কিশোরী আদিম মানব মানবীর মতো দুর্বোধ্য হেসে উঠল হঠাৎ। আর তিনটে ছায়ামূর্তির মতো শৌনক, সঞ্জয় আর জন্মেজয় ধীর পায়ে পাশাপাশি উঠে এল একই ছাদের নিচে।

দৃশ্যটা খানিকটা অশ্লীল। আবার অন্যভাবে দেখলে, তেমন কিছু নয়। সম্ভবত বিস্তর হিন্দি সিনেমা দেখেছে ঝুমা। সেইরকমই একটা ভঙ্গিতে সে একটা ছেলের কোলে মাথা রেখে শুয়ে গান গাইবার চেষ্টা করছে। ছেলেগুলো মৃত পশুর চারপাশে শকুনের মতো ঘিরে আছে তাকে। ঝুমার পায়ে হাত বোলাচ্ছে একজন, অন্যেরা অন্যান্য জায়গায়। মাঝে মাঝে সম্ভবত সুড়সুড়িতেই খিলখিল করে হেসে উঠছে ঝুমা। তিনজন আগন্তুকের আগমন মিনিট খামেক তারা টের পেল না।

তারপর একজন হঠাৎ টান টান হয়ে বলল, কওন ?

চারজন বনাম তিনজন। ঝুমা কোন্ দলে তা এখনো বোঝা যাচ্ছে না। সম্ভবত ওই দলেই। সেক্ষেত্রে তিনজন বনাম পাঁচজন।

চারজন অবাঙালি যুবকের একজন উঠে দাঁড়িয়ে সভয়ে ভাঙা বাংলায় বলল, কী দাদা, কী চাই ?

শৌনক কাউকে কিছু বলল না, শুধু নিচু হয়ে ঝুমার হাত ধরে টেনে দাঁড় করাল।

একটা বাজ এমন কান ঘেঁষে পড়ল যে সুমন্ত্র যেন ঝলসে গেল তার তাপে। আর কানদুটো ভোঁ ভোঁ হয়ে গেল।

বরাবরই লক্ষ্য করেছে সুমন্ত্র যে, তার কপালে সবকিছু এরকমই হয়। রাস্তায় নামতেই অটোমেটিক ছাতাটা প্রবল বাতাসে ঝড়াক করে উল্টে গেল। ইচ্ছে হলো, ছাতাটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির ছাতা বলে ফেলল না। শুধু রাগ করে বাগানের মধ্যে ছুঁড়ে দিলো। পরে খুঁজে নিলেই হবে।

প্রবল বৃষ্টিতে চোখের পলকে কাকভেজা হয়ে গেল সুমন্ত্র। অন্ধকারে অচেনা রাস্তায় সে কোথায় চলেছে তাও বুঝতে পারছিল না। বুলা শুধু অনির্দিষ্ট একটা ইংগিত দিয়েছে, এ বি ব্লকটা কোন্ দিকে। রাস্তায় একটাও লোক নেই যাকে জিজ্ঞেস করা যায়। কোনো বাড়িতে ঢুকে জিজ্ঞেস করতে গেলে কপালে মারধর অপমান জোটা বিচিত্র নয়।

মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল বটে, কিন্তু লোডশেডিং-এর নিবিড় অন্ধকারের তাতে কোনো উপকার হচ্ছে না। সুমন্ত্র কিছুক্ষণ পরেই রাস্তা গুলিয়ে ফেলল। ভয় হচ্ছিল, শ্বশুরবাড়িতে ফিরে যেতে পারবে কিনা আদৌ।

কংক্রিটের দিক নির্দেশক একটা পেয়ে গেল সুমন্ত্র। টর্চের আলো জ্বালতে গিয়ে দেখল, সেটা জ্বলছে না। দোষ নেই। জল ঢুকেছে টর্চে! অগত্যা উবু হয়ে বসে বিদ্যুৎ-চমকে পড়ে নিল এ বি ব্লক ডানদিকে।

কিন্তু ডানদিকের রাস্তায় ঢুকেই সুমন্ত্র বুঝতে পারল, এদিকে বাড়িঘর নেই। লোক চলাচলের অভাবে রাস্তায় দূর্বাঘাস গজিয়েছে। দু'ধারে ফাঁকা ভূতুড়ে সব প্লট এবং প্রচুর আগাছা।

স্বাভাবিক অবস্থায় সুমন্ত্র ভগবানে বিশ্বাস করে না। কিংবা করলেও সে তা জানে না। সোজা কথায় ভগবান আছে কি নেই তা নিয়ে সুমন্ত্র মাথাও ঘামায় না। কিন্তু মাঝে মাঝে বিপদে পড়লে তার মনে হয় ভগবান থাকলে বেশ হতো।

আছো নাকি হে? সুমন্ত্র একবার জিজ্ঞেসও করে ফেলল ভগবানকে। কিন্তু জবাব পেল না। বৃষ্টির ঝরোখায় ঢাকা চারদিকটাকে সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না। কোথায় যাবে সে? কী করবে?

একটা গাড়ির হেডলাইট আদিম অন্ধকারকে ছিন্নভিন্ন করে দিলো হঠাৎ। আর তখন লক্ষ বল্লমের মতো ছুটে আসা বৃষ্টির খরশান চেহারাটা দেখতে পেল সুমন্ত্র।

গাড়িতে অনেক দূরে। সুমন্ত্র তার আলো লক্ষ্য করে একরকম ছুটতে লাগল। সামনেই একটা নিচু দেয়াল। ওটাই কি সেই পার্ক? ভেতরটা

জঙ্গলে ভরা।

গাড়িটা এদিকে এল না। হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে অন্য একটা রাস্তা দিয়ে ভীষণ জোরে বেরিয়ে গেল।

মাথায় ক্রমান্বয়ে চাঁটি মেরে যাচ্ছে টোপা টোপা বৃষ্টির ফোঁটা। ডুগডুগ শব্দ হচ্ছে। ঝুমাকে যারা ধরে নিয়ে গেছে তারা কি ওই গাড়িতে পালিয়ে গেল?

সুমন্ত্র পার্কের কাছাকাছি এসে গাড়লের মতো দাঁড়িয়ে রইল। এখন কী করবে সে? কী করা উচিত? পৃথিবীর কেজো ও সাহসী মানুষেরা এই-রকম পরিস্থিতিতে কী করে থাকে?

আর একটা গাড়ির হেডলাইটও প্রায় একই জায়গায় জ্বলে উঠতে দেখল সুমন্ত্র। সেই গাড়িটাও অন্য পথ দিয়ে চলে গেল।

কিছু একটা করা উচিত, এরকম একটা অনিচ্ছুক তাগিদে সুমন্ত্র পার্কের দেয়ালটা ডিঙোবে বলে দুহাতে রেলিংটা চেপে ধরল।

উঠতে যাবে, ঠিক এমন সময় রাস্তা থেকে একটা গাড়ি ডানদিকে মোড় নিয়ে সোজা পার্কের দিকে চলে আসতে লাগল। হেড লাইটের চোখ-ধাঁধানো আলো সোজা তার ওপর এসে পড়েছে।

সুমন্ত্র সভয়ে পার্কের মধ্যে ঢুকে পড়ার জন্য দু হাতে চাড় দিয়ে রেলিং-এ ওঠবার একটা অক্ষম চেষ্টা করতে গিয়ে হড়কে পড়ে গেল নিচে। আর একটা মোটা গলা চেঁচিয়ে একটা ধমক দিলো তাকে, অ্যাই, খবর্দার নড়বে না!

সুমন্ত্র নড়ল না। এমন কি উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা পর্যন্ত করল না। জলকাদার ওপর অতিশয় স্থিরভাবে বসে দেখল, গাড়িটা পুলিশের জীপ। তিনজন বর্ষতিঢাকা লোক নামল। সঙ্গে এক মহিলাও।

এ কী! তুমি এখানে বসে রয়েছো কেন? কী হলো তোমার?

গলাটা বুলার।

এবার সুমন্ত্র উঠে দাঁড়াল। কিছু বলার মতো অবস্থা নয়।

কাউকে দেখেছো ?

সুমন্ত্র মাথা নেড়ে বলল, দুটো গাড়ি ওই দিকে দাঁড়িয়ে ছিল। কয়েক মিনিট হলো চলে গেছে।

পুলিশের তিনজন লোকের একজন বুলার দিকে চেয়ে বলল, আপনার হ্যাণ্ডব্যাগ ?

হ্যাঁ।

আপনারা জীপে উঠে বসুন, আমরা দেখছি।

সুমন্ত্র আর বুলা জীপে উঠে বসল। ড্রাইভারও পুলিশের লোক। মুখ ফিরিয়ে বলল, চিন্তা করবেন না। ওয়্যারলেসে খবর চলে গেছে। সল্ট লেক থেকে বেরোনোর রাস্তায় গাড়ি চেক করা হবে।

বুলা আর সুমন্ত্র কোনো কথা বলতে পারল না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনজন পুলিশ ফিরে এসে জীপে উঠল।

বুলা আর্তস্বরে বলল, কী হলো ?

বোঝা যাচ্ছে না কিছু। পার্কে কেউ নেই। যে-লোকটা ফোন করেছিল তাকে কোনোরকমে ট্রেস করা গেলে হতো।

লোকটা যে নাম বলল না।

এই লোকটাই আপনার মাকে মাঝে মাঝে ফোন করে ?

হ্যাঁ।

অ্যানোনিমাস কল ?

হ্যাঁ।

স্ট্রেঞ্জ !

জীপটা আবার চলতে লাগল।

সুমন্ত্র নিজেকে নিজেই মনে মনে প্রশ্ন করছিল, আমি কি ভীষণ কাপুরুষ? ভীষণ ? বুলার চোখে এখন আমি কিরকম ? পুলিশরা আমাকে কী ভাবছে?

৯

ডাইনিং টেবিলের ছুটো চেয়ারে আসামীর ভঙ্গিতে বসে আছে সুবীর আর অর্চনা। সামনে ছু পা ছুদিকে ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আঙুল নেড়ে অনেকটা থিয়েটারী ভঙ্গিতে অবু চিৎকার করছিল, তোমরা! তোমরাই এর জন্য দায়ী। প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলেছো, এখন যা খুশি করছো। এই অসভ্য লোকটা সংসারের দায় ঘাড়ে নেয় না, কোনো রেসপনসিবিলিটি নেই, ছাদে বসে মদ খাওয়াই এই লোকটার এখন একমাত্র কাজ। লাথি মারতে মারতে বের করে দিতে হয় এসব লোককে বাড়ি থেকে···

অর্চনা চোখে আঁচল চাপা দিয়ে অশ্রু রোধ করল। বলল, তোর বন্ধুবান্ধব-দের টেলিফোনে একটু খবর দে না। সবাইকে অ্যালার্ট করাটা ভীষণ দরকার। কোথায় গেছে তার তো ঠিক নেই।

অবু গলা আরও তুলে বলল, কার দায় পড়েছে এই ব্যাড ওয়েদারে তোমার মেয়েকে খুঁজতে বেরোবে? ঝুমা তো আর কচি খুকি নয়। যা করেছে ভেবে-চিন্তেই করেছে।

ঝুমার জন্য কোনো ছুশ্চিন্তাই করছিল না সুবীর। সে তো জানে পৃথিবীর সব সমস্যারই একটা না একট সমাধান হয়ই। শুধু টাইম ফ্যাক্টর। সময়ই সব সমস্যার নিরসন করে দেয়। যে নিখোঁজ হয় সে যদি আর ফিরে নাও আসে তাহলেও একদিন সবাই তার কথা ভোলে। যে মরে যায় সে হয়তো কত অসহায় অবস্থায় ফেলে যায় তার পরিবার-পরিজনকে। কিন্তু মরে বেঁচে লড়াই করে সেই পরিবারটাও হয়তো টিঁকে যায় শেষ পর্যন্ত, বা লোপাট হয়ে যায়। কিছু একটা হয়। কোনো কিছুই চিরকাল থাবা গেড়ে

তো থাকতে পারে না। সুবীর তাই মনে মনে ঝুমাকে আজ পৃথিবীর হাতে সমর্পণ করেছে। তার আর কোনো চিন্তা নেই।

সামনে যে যুবকটি দাঁড়িয়ে ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছে তার দিকে কিছুটা বিস্ময়ভরে চেয়ে আছে সুবীর। এই যুবকটিও একটি টাইম ফ্যাক্টরের প্রোডাক্ট। যখন ছোটো ছিল তখন শিশু অবস্থায় যুবকটি ছিল খুবই নরম সরম মেয়েলী ধরনের, আর খুব ভীতু। পড়ত কো-এডুকেশনের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে। প্রচুর ফুটফুটে মেয়ের দঙ্গলে ছেলেটা একরকম হারিয়ে যেত। সুবীর একটু ভয় পেয়েছিল, ছেলেটার মধ্যে পৌরুষের অভাব দেখা দেবে না তো! তাই সুবীর শিশুটির মধ্যে পুরুষালী হাবভাব সঞ্চার করার জন্য রোজ সকালে নিয়ে যেত লেক-এর ধারে। ছেলে আর বাবা দৌড়োতো কেডস পরে। সাইকেল চালানো শেখাল ছেলেকে, সাঁতার শেখাল, তারপর ভর্তি করল একটা ফুটবল ক্লাবে। কিশোর বয়সে হাতে পায়ে রীতিমতো সবল ও রুক্ষ হয়ে উঠল অবু। ঠিক যেমনটি সুবীর চেয়েছিল। ওর গা থেকে পুরুষালী তাপ আর গন্ধ পেত সুবীর। খুশি হতো। বাপের ন্যাওটা এবং বশবর্তী সেই শিশুটিই যখন আজ এই বিদ্রোহী যুবকের রূপ ধরে সামনে এসে দাঁড়ায় তখন সেটিকেও পৃথিবীর নিয়ম বলেই মেনে নেয় সুবীর। সে আজকাল সবকিছুই মেনে নিতে শিখেছে।

বুকে যে ব্যথাটা থাবা মেরে আছে সেই থেকে সেটাও কি নিয়ম?

অবু চিৎকার করছিল···আমাকে বলে কী লাভ? আমি কিছু করতে পারব না। রেসপনসিবিলিটি তোমাদের, তোমরা বোঝো গে।

অর্চনা নরম সুরে বলল, তুই অত রেগে যাচ্ছিস কেন? বিপদে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়। ওরা সবাই গেছে, খবর একটা আসবেই। তুই শুধু একটু গিয়ে ঘুরে আয়। জামাই প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে গেল···

গেছে যাক। তোমার ননীর পুতুল জামাই আর একজন অপদার্থ। লোক-টাকে দেখলেই ঘেন্না হয়···

শিশুটিকে বড়কর তে অনেক খরচ হয়েছিল সুবীরের। দুজন প্রাইভেট

টিউটর, প্রচুর জামাকাপড়, সাইকেল, খেলনা, বিভিন্ন ক্লাবের খরচ। শিশুটি এখন বাস্তবিকই বড় হয়েছে। বাহবা দেওয়ার মতন, হাততালি দেওয়ার মতো বড়।

বুকের ব্যথাটা আচমকা বেড়ে ফের একটু কমে গেল। সুবীর একটু ককিয়ে উঠল। হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে জলের জগটা নিল সুবীর। পেটে গ্যাস জমে গিয়ে থাকবে। হার্টে চাপ দিচ্ছে। ঠাণ্ডা জল খানিকটা খেয়ে নিল সুবীর। একটা ঢেঁকুর তোলবার চেষ্টা করল। কিন্তু উঠল না।

শরীরটা কেমন ঝিমঝিম করছে। এই অবস্থায় যুবকটি আরও চেঁচালে তার অসুবিধে হবে।

চুপ! সুবীর হিংস্র গলায় যুবকটিকে বলল।

যুবকটি তার মাকে কিছু বলছিল। ভালো শুনতে পাচ্ছিল না সুবীর। সম্ভবত সুবীরের হিংস্র গলার 'চুপ' শব্দটাও যুবকটি শুনতে পায় নি। হাত পা নেড়ে চেঁচিয়ে যাচ্ছে।

চেঁচাল আইকও। অনেকক্ষণ সহ্য করেছে, আর পারল না।

আউফ! আউফ! আউফ!

একটা গাড়ির শব্দ হলো কি? নাও হতে পারে। সুবীর উঠে দাঁড়ানোর একটা চেষ্টা করল।

গাড়িটা ফটকের সামনে থেমেছে।

বুলা! বুলা! মাসীমা!

সেই ডাকে অর্চনা, অবু, সুবালা, আইক সবাই ছুটে গেল বাইরে।

যেতে পারল না সুবীর। তার কাছে এক পদক্ষেপের দূরত্বও এখন অসীম। তবু সে বুকের প্রচণ্ড ব্যথাটাকে হাত দিয়ে ঘষে মিশিয়ে দেওয়ার একটা অক্ষম চেষ্টা করল। তারপর দেয়াল ধরে ধরে নিজের ঘরে এল সে। বাতিটা নেবালো। ভালোই।

হামাগুড়ি দিয়ে বিছানায় ঢুকল সুবীর। তারপর উপুড় হয়ে পড়ে রইল। ব্যথা! বড় ব্যথা! ঘাম দিচ্ছে কপালে। শিথিল হয়ে যাচ্ছে হাত পা।

সুবীর চোখ বুজল। তারপর একবার কাউকে ডাকবার চেষ্টা করল কাকে ডাকল তা সে জানে না। এ বাড়িতে কে আছে তার?

সম্ভবত সে ডাকল, মা।

তারপরই চেতনা লুপ্ত হয়ে গেল তার।

ঝুমাকে যখন চড়া আলোর সামনে বাইরের ঘরের মাঝখানে এনে দাঁড় করানো হলো তখনও সে ঘোর মাতাল। টলছে, পড়ো-পড়ো হয়েও দাঁড়াচ্ছে বলছে, ছেড়ে দাও···ছেড়ে দাও···ছেড়ে দাও···

অর্চনা একটা থাপ্পড় তুলেছিল, শৌনক আটকাল, মারবেন না। বরং যদি পারেন খানিকটা তেঁতুলজল খাইয়ে দিন। বমি করলে নেশা কেটে যাবে। আর নইলে জাস্ট শুইয়ে দিন। ঘুমোক।

তোমরা যা করলে···

তৃতীয় যুবকটিকে ভালো লক্ষ্য করে নি অর্চনা। একটু পিছিয়ে আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল। শৌনক তাকে সামনে টেনে এনে বলল, একে তো বোধহয় চেনেন। জন্মেজয় দত্ত। আপনাদের প্রতিবেশী। ইন ফ্যাকট ইনি না থাকলে কী যে হতো। চেনেন না একে? ইনিই তো ফোন করেছিলেন···

ফোন? আচমকা অর্চনা যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। ছিপছিপে লাজুক সুদর্শন এই যুবকটিই কি তাহলে—

কাতরস্বরে ঝুমা বলছিল, ছেড়ে দাও না আমাকে···আমি ওদের সঙ্গে যাবো। কত আদর করছিল ওরা জানো? তোমাদের মতো পাষাণ তো নয়। পায়ে পড়ি···ছেড়ে দাও।

ঝুমা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ছিল। জন্মেজয় ওকে ধরে ফেলল পেছন থেকে। জরুরী গলায় বলল, ওর শোওয়ার ঘরটা কোন্ দিকে বলুন তো!

অর্চনা গলার স্বরটা শুনে আর একবার শিহরিত হলো। এই তো সেই কণ্ঠ-স্বর! সে তাড়াতাড়ি মেয়ের অন্য হাতটা ধরে বলল, আসুন দেখিয়ে দিচ্ছি।

ঝুমার অন্ধকার ঘরে পা দিয়েই অর্চনা দরজাটা ভেজিয়ে দিলো। ঘুম-আলোর স্যুইচ টিপতেই এক মায়াময় সবুজে ভরে গেল ঘর। ঝুমাকে বিছানায় শোওয়ানোর অপেক্ষা মাত্র। বালিশে মাথা রেখেই সে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল। ধীরে মুখ তুলল অর্চনা। মুখোমুখি জন্মেজয়। চোখে চোখ। আমি যাচ্ছি। একটা কথা ছিল।

বলুন।

আপনার গলার স্বরটা আমার এত চেনা লাগছে কেন বলুন তো!

অ্যাঁ! ওঃ!

আপনি আমাদের ফোন নম্বর জানলেন কী করে?

ড্রিম লাইটের মৃদু আভায় মুখের ভাব তো বোঝা যায় না। অর্চনাও বুঝতে পারল না। ছেলেটা চোখটা নামিয়ে নিল।

অর্চনা মৃদু স্বরে বলল, আমি কিন্তু রাগ করছি না।

জন্মেজয় হাঁফ-ধরা স্বরে বলল, দরজাটা খুলে দিন।

অর্চনা একটু হেসে বলল, এত ভয়! টেলিফোনে তো দেখি খুব সাহস!

দরজাটা খুলে দিলো অর্চনা। ধীর পায়ে ছেলেটা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অর্চনা আপনমনে একটু হেসে বলল, বেচারা!

ওরা চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ অর্চনার মনের মধ্যে একটা শব্দ ঘুরে ঘুরে টক্কর খেতে লাগল আর কতবার যে বিদ্যুৎ স্পর্শ করল তাকে। জন্মেজয়! জন্মেজয়! সে কি বয়ঃসন্ধিতে ফিরে গেল নাকি? শরীর ও মনে এত পিপাসা জমা হয়েছিল তার সে তো কখনো টের পায় নি! ভেতরে যেন সেতার বেজে যাচ্ছে অবিরল।

তার এই ঘোরের মধ্যেই একটা জীপ এসে থামল। পেছনে তিনজন পুলিশের চালচিত্র নিয়ে ঘরে এসে দাঁড়াল বুলা আর সুমন্ত।

মা! ঝুমা!

ঘোরলাগা ভাবটা কাটে নি অর্চনার। পৃথিবীকে ভারী নতুন লাগছে তার। যেন এরকম ছিল না কিছুই এর আগে। আচমকা বিবর্ণ বসন ছেড়ে এক

নতুন পৃথিবী জেগে উঠল চারধারে। কী রং, কত না জেল্লা তার!

জড়োসড়ো ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল অর্চনা, চিন্তা নেই। ঝুমা ফিরেছে। কিছু হয় নি, সব ঠিক আছে।

ক্লান্ত বুলা 'উঃ' বলে মুখ ঢেকে সোফায় বসে পড়ল।

অকারণে আইক বিষণ্ণ দীর্ঘ আওয়াজ তুলল, আউফ! আউফ! আউফ!

আইক আরও একবার ডাকল। মধ্যরাতে।

সেই শব্দে সুবীরের চোখ মেলল। বড় ক্লান্তি, বড় ভার বুকে। কে যেন হারিয়ে গিয়েছিল! সে কি ফিরে এল, না কি এল না? কে যেন শিশু থেকে যুবক হলো? টেলিফোনে কে প্রেম নিবেদন করেছিল কাকে?

সুবীরের বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। আজ কেউ জল রাখে নি তার ঘরে। বুকের ব্যথাটা থাবা গেড়ে আছে এখনো। তীব্র নয়, কিন্তু আছে।

দেয়াল ধরে ধরে সুবীর বসবার ঘরে এল। ফ্রিজ খুলে একটা ঠাণ্ডা বোতল বের করে সরাসরি মুখে তুলতে গেল। তারপর হঠাৎ এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে পাথর হয়ে গেল সে।

ঘরের মাঝখানে আইক। পেছনের দু'পায়ের ওপর ভর দিয়ে সামনের দুটো পা ওপরে তুলল। করজোড়? দীর্ঘ বিষণ্ণ একটিমাত্র আওয়াজ করল সে, আউফ!

এই পৃথিবীর প্রতি তার গভীর ধিক্কারের শব্দটা ঘরের মধ্যে অশরীরী ঘুরে বেড়াতে লাগল।

তারপর ধীরে ধীরে রোমশ শরীরটা ঢলে পড়ে গেল মেঝের ওপর।

আতঙ্কে কিছুক্ষণ বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল সুবীর। হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেল জলের বোতল!

সুবীর নিজের বুকটা চেপে ধরল। ব্যথা! ভীষণ ব্যথা!

তারপর ধীরে ধীরে আবার সহজ হলো সে টাইম ফ্যাক্টর। টাইম ফ্যাক্টর।

পৃথিবীতে কিছুই নতুন করে ঘটে না। সব ঘটনাই পুনরাভিনীত হয় মাত্র।

আইকের মৃতদেহ সামনে রেখে ফের একটা বোতল বের করে হিম-ঠাণ্ডা

জল ঢকঢক করে আকণ্ঠ পান করতে লাগল সুবীর।

তিন দিন বাদে টেলিফোন এল।

অর্চনা বলল, হ্যালো।

আমি বলছি।

অর্চনা উদ্ভাসিত হয়ে বলল, তুমি!

একটু ঝুমাকে ডেকে দেবেন?

ঝুমা! তাকে কেন বলো তো!

তাকেই দরকার।

খুব ধীরে ধীরে টেলিফোনটা কাত করে টেবিলে রাখল অর্চনা। ফ্যাকাসে মুখে ধীরে ধীরে গিয়ে ঝুমার দরজায় টোকা দিলো।

ঝুমা!

কী বলছো?

তোর টেলিফোন।

হারিয়ে যাওয়া

১

জ্ঞান ফিরে আসার পর লোকটা অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইল ভুটিয়ার মুখের দিকে। ভারী স্থির দৃষ্টি, নির্বাক মুখ। জগৎ-জীবনের সঙ্গে যোগা-যোগ নেই তখনও, চেতনার একটা খামতি ভরে তোলার চেষ্টা করছে। চারদিকে বিয়ে-বাড়ির হৈচৈ, তার মধ্যে উটকো একটা লোকের প্রবেশ ও সংজ্ঞা হারানোর ফলে ভারী বিতিকিচ্ছিরি কৌতূহল, আহা-উহু চেঁচামেচি শুরু হয়েছিল। ভুটিয়া লোকটাকে পাঁজাকোলে করে তুলে নিয়ে এসেছিল ভাড়াটে বিয়ে-বাড়ির ভাঁড়ার ঘরের পাশের চিলতে প্যাসেজে। এখানে আলো-হাওয়া কম বটে, কিন্তু ভিড়-ভাট্টাও নেই। বর এখনও আসে নি ভাগ্যিস, নইলে ও-পক্ষও ভ্রূ তুলত।

জলের ঝাপটা, পাখার বাতাস চলছিলই। বিয়ে-বাড়িতে আমন্ত্রিতদের মধ্যে দু'একজন ডাক্তার থাকে। তাদের,একজনকে ধরে এনেছিল দিদির দেওর নন্দ। ছোকরা ডাক্তার, দেখে-শুনে বলল, কিছু নয়। ঠিক হয়ে যাবে। একটু রেস্ট দরকার। মনে হয় একজস্টেড।

আশ্চর্যের বিষয়, লোকটাকে কেউ চেনে না। নিমন্ত্রিত কিনা কেউ বলতে পারল না। সন্ধ্যের মুখে সানাই বাজছে, বেলফুল আর নানা নির্যাসের সুগন্ধ ছড়িয়ে মেয়েরা সবে আসতে শুরু করেছে। ভুটিয়াও সিল্কের পাঞ্জাবি আর চওড়া পেড়ে ধুতিতে ফিটফাট সেজে পজিশন নিয়ে রেখেছিল। হঠাৎ সেই সময় লোকটা ঢুকল। তেমন ছোকরা বয়সের নয়, তবে বড়জোর বছর পঁয়ত্রিশ বয়স হবে। পরনে ধুতি আর পাঞ্জাবি। মোটামুটি ভদ্র চেহারা। তবে রোগা আর ভারী বিষণ্ণ মুখ। ঢুকে চারদিকে চাইছিল। একটু ইতস্তত

ভাব।

কাকে যেন জিজ্ঞেস করল, এখানে কি তুধলির বিয়ে হচ্ছে ?

তারপর লোকটা অভ্যাগতদের জন্য সাজানো একখানা ফোল্ডিং চেয়ারে বসে রুমাল বের করে মুখের ঘাম মুছল।

ভুটিয়া এইটুকু দেখেছিল। তারপরই যে মেয়েটা বিয়ে-বাড়িতে ঢুকল সে ভুটিয়ার বুকে হাফসোল মেরে মাত্র ছমাস আগে দিল্লির এক ঘ্যাম অফিসারকে বিয়ে করে বসেছে। অবন্তী। পার্থর বোন। না, অবন্তীর দিক থেকে নয় অবন্তী হয়তো ভুটিয়াকে নিয়ে ভাবেই নি কিছু, কিন্তু ভুটিয়ার দিক থেকে তো একতরফা ছিল টেলিপ্যাথি। লাগাতার।

ভুটিয়া উঠে দাঁড়িয়ে শুধু বলেছিল, আরে অবন্তী ! এসো, এসো।

ভালো আছেন ?

ঠিক সেইসময় ফোল্ডিং চেয়ারসমেত লোকটা পড়ল। বিয়ে-বাড়ির নানা আওয়াজে তেমন শোনা যায় নি শব্দটা। নইলে আরও কেলো হয়ে যেত।

ভুটিয়ার একটা স্বভাব হলো, কোনো একটা কাজ ঘাড়ে এসে পড়লে সেটা জান-কবুল দিয়ে করে !

অবন্তীকে ভুলে সেই থেকে ভুটিয়া লোকটার পরিচর্যা করছে। পাখা, বাতাস, জল। তার পাঞ্জাবির বারোটা বেজেছে, ধুতি ভেজা, কপালে ঘাড়ে সপ্‌সপ্‌ করছে ঘাম।

লোকটা আধঘণ্টার চেষ্টায় এইমাত্র চোখ চাইল। তারপর চেয়েই রইল। ফ্যালফ্যাল ফ্যালফ্যাল।

ভুটিয়াও চেয়ে রইল। অনেকক্ষণ।

তারপর বলল, ও মশাই, শুনতে পাচ্ছেন ?

না, লোকটা শুনতে পাচ্ছে না। শুনলেও বুঝতে পারছে না।

ভুটিয়ার ঘাড়ে একটা গরম শ্বাস এসে পড়ল। জামাইবাবুর ঈষৎ চাপা এবং নার্ভাস গলা পাওয়া গেল, ভুটিয়া, ইজ ইট এ কেস অব বারগলারি ?

ভুটিয়া ফিরে জামাইবাবুর দিকে একটু তাকাল। নানা ভয়ভীতি নিয়েই

এই প্রিয়নাথ মজুমদারের জন্ম। ত্বনিয়ায় জামাইবাবুর ভয়ের জিনিস যে সংখ্যায় কত তা কখনও হিসেব করে উঠতে পারে নি ভুটিয়া। তার ওপর আজ জামাইবাবুর একমাত্রমেয়েরবিয়ে। শুধু একমাত্র মেয়েই নয়, ওনলি ইস্যু, সোল ওয়ারিশান। সকাল থেকে জামাইবাবু এমনিতেই লাতন হয়ে পড়েছিলেন। নার্ভাস, বিষণ্ণ, বিপন্ন, অস্থির।

ভুটিয়া মাথা নেড়ে বলল, না।

বারগলারি হলে সদর দিয়ে ঢুকত না।

লোকটার চেহারা দেখে কী মনে হয়?

ভদ্রলোক?

চেহারা জিনিসটা বড্ড ডিসেপটিভ জামাইবাবু।

কিছু আন্দাজ করা মুস্কিল। দেখুন না, ওই তো পড়ে আছে।

একটু সরো তো। এ জায়গাটায় আলো এত কম! ইঃ, জলে-কাদায় একেবারে জেবড়ে পড়ে আছে। চেনার উপায় নেই।

লোকটার জ্ঞান প্রায় ফিরে এসেছে। একটু সুস্থ হলেই পাবলিকের সামনে নিয়ে যাবো।

পাবলিকের সামনে? বলো কী?

গণআদালত জামাইবাবু। এ যুগে, ওটাই নিয়ম।

পাগল নাকি? এটা বিয়ে-বাড়ি মনে রেখো।

ভুটিয়া একটু হাসল। বলল, তাহলে কী করা?

কোনোও ঝামেলা না করে লোকটাকে বের করে দিও।

কিন্তু একটা প্রবলেম আছে।

কী প্রবলেম?

লোকটা একবার কাকে যেন জিজ্ঞেস করেছিল যে এখানে ত্বধলির বিয়ে হচ্ছে কিনা।

ত্বধলির নাম বলল? সর্বনাশ? তাহলে তোর ত্বধলির বন্ধু টন্ধু হবে।

না। লোকটার বয়স ত্রিশের ওপর। ত্বধলির বাইশ।

না হলেও চেনা হতে দোষ নেই।

সেখানেই তো প্রবলেম। ডুধলি এখন কনের সাজ পরে বসে আছে। একটু পরে বর আসবে। বিয়ে। এখন ওকে তুলে এনে একটা উটকো লোকের আইডেন্টিটি বের করার চেষ্টা কি ওয়াইজ হবে জামাইবাবু?

নো, নেভার। তবে জ্ঞান ফিরে এলে লোকটাকে জিজ্ঞেস করলে জানা যাবে, ইফ হি ইজ নট অ্যান ইমপস্টার অর এ থিফ। তোমার হাতেই কেসটা ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি।

যান। খুব উলু আর শাঁখ বাজছে। বোধহয় বর এলো।

ও বাবা।

বলেই জামাইবাবু প্রায় ছুটে চলে গেলেন।

ভুটিয়া ফিরে লোকটার দিকে তাকাতেই দেখল, লোকটা ফের চেয়ে আছে। তার দিকেই।

ভুটিয়া নিচু হয়ে বলল, শুনছেন?

ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব এলো, হ্যাঁ।

এখন কেমন বোধ হচ্ছে?

ভালো। অনেকটা ভালো।

উঠতে পারবেন?

পারব। একটু হেলপ করলে পারব। এখনও একটু উইক বোধ করছি।

ভুটিয়া তার দু'খানা অতিশয় জোরালো হাত বাড়িয়ে সাবধানে লোকটাকে বসাল। রোগাভোগা হালকা শরীর।

বসে লোকটা কিছুক্ষণ ঝুম হয়ে রইল। বোধহয় শরীরের অবস্থার হঠাৎ পরিবর্তনে মাথা ঝিমঝিম করছে। ভুটিয়া একখানা হাত সাবধানে পিঠে ঠেকনো দিয়ে রাখল। আবার না পড়ে-ফড়ে যায়।

একটু বসে থাকতে পারবেন? আমি একটা টাওয়েল বা গামছা নিয়ে আসি। হেভি ভিজে গেছেন।

লোকটা কোনো জবাব দিলো না। মাথার লম্বা চুল ভিজে কপালের দিকে

এসে পড়েছে। টপ টপ করে জল ঝরছে তা থেকে। পাঞ্জাবিটা বুকে কাঁধে অনেকটা জায়গা জুড়ে ভিজেছে। ধুতির অবস্থাও খারাপ। তবে তার চেয়েও লোকটার অবস্থা আরও করুণ।

তোয়ালে বেশি খুঁজতে হলো না। ক্যাটারারের একজন লোককে জিজ্ঞেস করতেই একখানা হাতমোছা তোয়ালে প্রায় জাদুকরের মতো বের করে দিলো।

ভুটিয়া ফিরে এসে দেখল, লোকটা একভাবেই বসে আছে। নড়ে নি।

নিন।

লোকটা হাত বাড়িয়ে তোয়ালেটা নিল। তারপর তোয়ালে দিয়ে মুখটা চেপে ধরল দু'হাতে। ওভাবেই বসে রইল।

ভুটিয়া বুঝে গেছে আজ বিয়ে-বাড়ির ফুর্তির বারোটা বেজে গেছে। এ মাল যতক্ষণ না ঘাড় থেকে নামছে ততক্ষণ দুধলির বিয়েটাই তার কাছে মাটি। জামাইবাবুর খুব ইচ্ছে ছিল বাড়িতে ভিয়েন বসবে, রান্না হবে, বাড়ির লোক পরিবেশন করে খাওয়াবে। ক্যাটারারের ব্যবস্থা জামাইবাবুর পছন্দ নয়। সে-ব্যবস্থা হলে ভুটিয়াকে এই বাবু-পোশাক ছেড়ে কোমরে গামছ জড়িয়ে গামলা হাতে দৌড়োদৌড়ি করতে হতো। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে জামাইবাবুকে রাজি করানো গেছে। ভুটিয়ার ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়েছে, কিন্তু এখন এ আর এক মামলায় খামোখা জড়িয়ে যাচ্ছে সে।

ভুটিয়া এবার একটু কঠিন হলো।

এই যে দাদা, একটা কথা শুনবেন?

লোকটা নড়ল না।

আজ যার বিয়ে হচ্ছে আমি হচ্ছি সেই দুধলির ছোটো মামা। বিয়ে-বাড়ির পাঁচটা কাজের দায়িত্ব এইসব মামা জ্যাঠা কাকাদের ঘাড়ে এসে পড়ে, আর তা করতেও হয়। বহুক্ষণ ধরে আপনার ফ্রিজ আর স্লো মোশন দেখে যাচ্ছি, কিন্তু বিশ্বাস করুন, বর এসে গেছে, আর আমার হাতে সময় নেই।

লোকটা মুখ থেকে তোয়ালেটা নামিয়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল।

আর একটা কনফিডেনশিয়াল কথাও বলছি মশাই। বিয়ে-বাড়ি হলো ব্যাচেলরদের মৃগয়ার জায়গা। আপনি কেলোটা না করলে এতক্ষণে অন্তত পাঁচ ছটা সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়ে যেত। বুঝলেন ?

লোকটা বুঝল কিনা বোঝা গেল না। তবে মাথাটা নামিয়ে একটা দীর্ঘ-শ্বাস ফেলল। তারপর উঠে দাঁড়াবার একটা অক্ষম চেষ্টা করতে গিয়ে টাল খেয়ে যাচ্ছিল। ভুটিয়া তাকে আবার দু'হাতে ধরে ধরে টেনে তুলল। দেয়ালে একটা হাতের ভর রেখে দাঁড়িয়ে লোকটা ক্ষীণকণ্ঠে বলল, আমি যাচ্ছি।

ভুটিয়া ফের হাসল, রাগ করলেন নাকি ? আরে আমি ঠাট্টা করছিলাম। কিন্তু যাবেন বললেই তো আর যাওয়া হয় না। আগে কেসটা শুনি। হঠাৎ আপনার ওরকম লোডশেডিং হয়ে গেল কেন ? এপিলেপসি আছে নাকি ?

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, জানি না।

মাঝে মাঝে এরকম হয় ?

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, না। শরীর একটা আছে, টের পাই। তবে তার বেশি খবর টবর রাখি না। বাইরে যাওয়ার রাস্তাটা কোন্‌দিকে ?

যাবেন মানে ? বিয়ে-বাড়ি থেকে কেউ শুধু মুখে ফিরে যায় নাকি ?

লোকটা সবিস্ময়ে একটু চেয়ে থেকে বলল, খেতে বলছেন ?

বলব না ? নইলে অমঙ্গল-ফমঙ্গল হয়ে যেতে পারে তো।

লোকটা দুঃখিত ভাবে মাথা নেড়ে বলল, খাওয়ার মতো অবস্থা নয়। আমাকে বরং আর একটু জিরোতে দিন। একটা ফোল্ডিং চেয়ার হলেই হবে। আর একটু জল।

হ্যাঁ হ্যাঁ, এক্ষুনি।

বলেই ছুটল ভুটিয়া। চেয়ার আর জলের বন্দোবস্ত হলো। দুটো চেয়ার মুখোমুখি, সরু প্যাসেজ প্রায় আটকে। লোকটা গ্লাসটা থেকে জল শুষে নিল। বলল, আর একটু।

বটেই তো। মাটির ভাঁড়ে আর কতটুকু জল ধরে ?

লোকটা অনেক জল খেল। চার গ্লাস। তারপর পকেট থেকে একটা বেশ ফর্সা নতুন রুমাল বের করে মুখ মুছে বলল, খুব কষ্ট দিলাম আপনাকে।

ভুটিয়া এবার প্রাসঙ্গিক হতে চায়। লোকটা কে এবং কেনই বা বিয়ে-বাড়িতে আগমন তা জানা দরকার। তাই সে ঘুরিয়ে প্রশ্ন করল, দুধলিকে কি আপনি চেনেন ?

দুধলি ? সে কে বলুন তো ?

শুনেছি আমার দিদির শ্বশুরের দুধলি নামে একটা গরু ছিল। বেশ ভালো গরু। খুব আদরের।

ও।

কথা আরও আছে। আমার যে ভাগ্নিটির আজ বিয়ে হচ্ছে তার নামও দুধলি। ওই গরু দুধলি থেকেই নামটা ধার নেওয়া। কিন্তু গরুর নাম হলে কী হবে, আমার ভাগ্নী দারুণ ইন্টেলিজেন্ট। পড়াশোনাতেও ব্রিলিয়ান্ট। চেনেন না ওকে ?

চিনি বললে ভুল হবে, সসঙ্কোচে লোকটা বলে।

চিনি না বললেও ভুল হবে কি ?

তাও হবে।

তাহলে ও প্রসঙ্গটা থাক। আপনার নাম কী ?

নন্দন সান্যাল।

কোথায় থাকেন ?

গর্চা সেকেণ্ড বাই লেন। বেশি দূরে নয়।

চিনি জায়গাটা, একসময়ে দুরবস্থায় ওখানে টিউশনি করতাম।

কার বাড়ি ?

ক্ষিতীশ দত্ত। চামার।

লোকটা এবার একটু হাসলো।

ভুটিয়া বলল, চেনেন লোকটাকে ?

না। আমি দু'বছর হলো ওখানে আছি মাত্র।

বেশ, বেশ,। এবার বলুন তো কেসটা কী!

লোকটা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। জবাব দিলো না।

কিছু খাবেন? গরম দুধ-ফুদ যোগাড় করা যাবে না, ব্রাণ্ডিও নেই: আর কিছু?

না। খাওয়ার কথা তো একবার হয়ে গেছে।

আপনাকে বেশ কাহিল দেখাচ্ছে বলে বলছি। হয়তো এখন আপনার খিদেটা চাগাড় দিয়েছে। হয়তো লজ্জা পাচ্ছেন।

না, লজ্জা পাচ্ছি না। এমন একটা শুভ কাজে আমি এসে একটা ভণ্ডুল লাগালাম, তার জন্য বড্ড সংকোচ বোধ করছি।

শরীর তো আপনার হাতে নেই। ভেতরের কলকজা কোন্‌টা কখন বিগড়োবে তারও ঠিক নেই। সংকোচ কিসের?

লোকটা চুপ করে রইল।

আপনি কিন্তু এখনও মাথা গা ভালো করে মোছেন নি। ভেজা গায়ে বসে থাকাটা কি ভালো?

ওঃ, হ্যাঁ। বলে লোকটা দুর্বল হাতে মাথা মুছতে লাগল।

এ পরিবারের কে কে আপনার চেনা?

লোকটা ভুটিয়ার দিকে তাকিয়ে একবার হঠাৎ একটু হাসল। আর হাসলে যে এই সাধারণ চেহারার নন্দন সান্যালকে বেশ সুন্দর দেখায় তা লক্ষ্য করল ভুটিয়া।

নন্দন মৃদু স্বরে বলল, আমি চুরি করতে ঢুকিনি বা বিনি পয়সায় ভোজ খাবো বলেও নয়।

এটা কি আমার কথার জবাব হলো?

একরকম হলো। আমি এ পরিবারের কাকে চিনি, তার মানে আপনি জানতে চাইছেন আমি লোকটা কে এবং কেমন।

অনেকটা তাই বটে। আপনাকে এখন পর্যন্ত কেউ আইডেন্টিফাই করতে

পারে নি।

নন্দন ভ্রূ কুঁচকে বলল, সকলেই কি আমাকে দেখেছে ?

ভুটিয়া মাথা নাড়ল, না। তুধলি দেখে নি।

আপনার দিদি সোমলতা ?

না। আপনি কি দিদিকে চেনেন ?

চিনি বললে ভুল হবে।

চিনি না বললেও ?

ঠিক তাই।

আপনি কি মশাই ক্যুইজ মাস্টার ? অনেকক্ষণ ধরে কথার প্যাঁচ মারছেন। দিদির সঙ্গে আপনার লাভ অ্যাফেয়ার ছিল না তো ! আপনার চেয়ে আমার এই দিদি কিন্তু বয়সে বড়।

জানি। লাভ অ্যাফেয়ারের প্রশ্ন ওঠে না।

উঠবে না কেন ? আমার দিদি সোমলতা দারুণ সুন্দরী ছিল। এমন কি সিনেমায় অবধি নেমেছিল একবার। অনেক ক্যাণ্ডিডেট ছিল। সবচেয়ে গোবরটাকে বিয়ে করল শেষ অবধি। অবশ্য টাকা আছে।

লোকটা আর একবার হাসল। বলল, আপনি দারুন ফ্রি, না ?

আমার পেটে কথা থাকে না, সবাই বলে।

এটাই ভালো। এ একটা বড় কোয়ালিটি।

সে তো বুঝলাম। কিন্তু আপনাকে যে প্লেস করা যাচ্ছে না। গর্চা সেকেণ্ড বাই লেনের নন্দন সান্যালমশাই, আপনিও এবার একটু খোলসা হয়ে পড়ুন। আচ্ছা, তুধলির সঙ্গে আপনার কোনোও অ্যাফেয়ার ছিল না তো! তুধলিও দারুণ মেয়ে। অনেক ক্যাণ্ডিডেট ছিল। তারা অনেকেই আজ এখানে বুকে কালো ব্যাজ এঁটে আনমনে ফিশফ্রাই চিবোতে চিবোতে ভাবছে, তুধলি এই বিয়েতে হ্যাপী হবে না।

নন্দন একটু হাসল। খুব করুণ দেখাল হাসিটা। তারপর বলল, তুধলির অনেক ক্যাণ্ডিডেট বুঝি ?

অনেক। আপনিও কি ?

নন্দনকথাটার জবাব দিলো না। মৃদু একটু হেসে শুধু বলল, আমার কাছে কিন্তু নেমন্তন্নের চিঠি আছে, দুধলির নিজের হাতে লেখা।

ভুটিয়া একটু লজ্জা পেয়ে বলল, আরে আরে, ইউ আর মোস্ট ওয়েল-কাম। দুধলির সঙ্গে দেখা করবেন ?

নন্দন মাথা নাড়ল, ঘটনাটা না ঘটলে করতাম। এই ভেজা জামাকাপড়ে তো যাওয়া যায় না।

ভুটিয়া মুখটা গম্ভীর করে শুধু বলল, প্রবলেম।

তাই বলছিলাম অন্য কোনোও একজিট থাকলে একটু দেখিয়ে দিন। চলে যাই।

অন্য কোনোও একজিট নেই। একটাই সদর ফটক। দু'ধারে গেস্ট বসে আছে। অবশ্য আপনি যদি পাঞ্জাবিটা খুলে দেন তাহলে ফ্যানের নিচে ধরে রেখে দশ মিনিটে শুকিয়ে দেওয়া যায়। ভেতরে কি ছেঁড়া গেঞ্জি আছে ? থাকলেও ক্ষতি নেই। এখানেই বসে থাকবেন ততক্ষণ। লোকে দেখলে বড়জোর ভাববে একটা গরিব লোক বসে আছে। বিয়ে-বাড়িতে গরিবলোক তো কতই থাকে।

আমিও গরিব। আর গরিব বলেই—নন্দন থেমে গেল।

ভুটিয়া একটু ঝুঁকে বলল, ব্রেক কষলেন কেন ? দিব্বি তো একটা স্টোরি বেরিয়ে আসছিল।

আমার গেঞ্জিটা অবশ্য ছেঁড়া নয়।

ভুটিয়া একটু হতাশ ভঙ্গিতে বলল, ড্রিবল করে বেরিয়ে গেলেন দাদা !

নন্দন আবার হাসল। বলল, ড্রিবল করতে আমি জানিই না। জানলে কি এই অবস্থা হতো ?

ওধারে একটা কলরব উঠল। মেয়েরা উলু দিচ্ছে, শাঁখ বাজছে, দুধলিকে বোধহয় পিঁড়িতে ওঠানো হচ্ছে। ভুটিয়া একটু কান খাড়া করে শব্দটা শুনল। তারপর নন্দনের দিকে চেয়ে বলল, এ সময়টায় বেরিয়ে যাওয়াই

সেফ। কেউ লক্ষ্য করবে না।

চলুন। বলে উঠতে যাচ্ছিল নন্দন।

আচমকাই একটা সুগন্ধের ঝলক এলো বাতাসে। ভুটিয়া পিছু ফিরে দেখল, নির্জন প্যাসেজে খোলা দিকটায় তার দিদি সোমলতা দাঁড়িয়ে আছে। আজকাল মেয়েদের বয়স বোঝে কার বাপের সাধ্যি। পঞ্চাশের পরও তারা দিব্বি যুবতী বা ছুকরিই থেকে যাচ্ছে। ভুটিয়ার দিদিও তাই। চল্লিশ তো হবেই। কিন্তু অসম্ভব সুন্দরী, ছিপছিপে এই মহিলাকে বয়সহীনা বলে বোধহয়।

ভুটিয়া তাড়াতাড়ি উঠল, আরে দিদি! তুই এসময়ে উঠে এলি কেন?

সোমলতা সুন্দরী বটে, কিন্তু বেশ কঠোর স্বভাবের মহিলা। দাপট তার সাঙ্ঘাতিক। সোমলতাকে সমঝে চলে না এমন মানুষ খুব কমই আছে।

সোমলতা নন্দনকে দেখতে পায় নি। ভুটিয়ার প্রকাণ্ড শরীরের আড়ালে লোকটা আড়াল পড়েছে।

সোমলতা ভুটিয়ার দিকে চেয়ে বলল, কে একজন যেন ঢুকে পড়েছে শুনলাম! কে বল তো?

ভুটিয়া শশব্যস্ত ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, এই যে, ইনি। হঠাৎ গরমে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। এখন ঠিক আছে।

সোমলতা একটু এগিয়ে এলো। তারপর থমকে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে তার মুখ কেমন যেন হয়ে গেল।

আর সোমলতার মুখোমুখি দাঁড়ানো লোকটা তখন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। ভেজা পাঞ্জাবি, এলোমেলো চুল। এতক্ষণ বেশ ডিফেনসিভ, বিনয়ী আর অপ্রতিভ মনে হচ্ছিল নন্দনকে। কিন্তু সোমলতার মুখোমুখি হঠাৎ তার চরিত্র পাল্টে গেল।

ভুটিয়ার মনে হলো, লোকটার দুটো মরা চোখে একটা চাপা আগুন ঝলসে উঠল।

২

আচ্ছা, আজ কি তুমি সারাদিন উপোস করে ছিলে ?

না তো।

চা খেয়েছো ? ভাত-টাত ?

হ্যাঁ। ভাত মাছ মাংস। কেন, দোষ হয়েছে ?

দোষ হবে কেন? জানতে চাইছিলাম। বিয়ের দিন কনেকে উপোস করতে হয়, এটাই তো নিয়ম ছিল।

সে তো পুরোনো নিয়ম। কে মানছে আজকাল ?

আমি কিন্তু উপোস করে ছিলাম। জল ছাড়া কিছু খাই নি।

সত্যি ? তুমি কি একটু সেকেলে ? রক্ষণশীল ?

কি জানি। আমার মনে হয়েছিল, সব নিয়ম-টিয়ম মেনেই বিয়ে করা উচিত।

তার মধ্যে কি এটাও ছিল যে, বিয়ের আগে তুমি কনেকে দেখবেও না একবার ?

না, তা নয়। আসলে সারপ্রাইজটা নষ্ট হয়ে যাবে ভয়ে আমি তোমাকে দেখতেও চাই নি। তোমার ফটোও আমাকে দেখানোর চেষ্টা হয়েছিল, আমি দেখি নি।

বাব্বাঃ! কিন্তু যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছো তার সম্পর্কে কৌতূহল হবে না ?

হবেই তো। আর সেটা বজায় রাখার মধ্যেই তো মজা।

তুমি বেশ অদ্ভুত আছো।

তুমি কিরকম ?

আমি ! আমি কিরকম তা নিজে কী করে বলবো ? তুমি বলবে। শুনে-

ছিলাম তুমি দারুণ সুন্দরী।

দেখে তাই মনে হচ্ছে ?

হচ্ছে। কিন্তু সৌন্দর্যটা তো স্কিন ডীপ।

সে তো সবাই জানে, তবু সুন্দরীই খোঁজে কেন বলো তো !

সৌন্দর্য জিনিসটা তো খারাপ নয়। চোখের পক্ষে ভালো। বউ সুন্দরী হলে ইট ইজ গুড বিগিনিং।

তুধলি একটু হাসল। কিন্তু সেটা খুশির হাসি নয়। তার অস্বস্তি হচ্ছে। তার আনকোরা স্বামীটিকে সে এই প্রথম দেখছে। দেখতে দারুণ ভালো। রংটা চাপা হলেও বেশ লম্বা চওড়া, মাসকুলার, বিশাল চাকরি করে, স্মার্ট। সব ঠিক আছে, কিন্তু কথাবার্তা একটু কেমন কেমন নয় ?

তুমি কি একটু টায়ার্ড ?

তুধলি মাথা নেড়ে বলল, ভীষণ। এত গরম পড়েছে !

তা ঠিক।

তার ওপর বেনারসী, গয়না, যজ্ঞের ধোঁয়া, বড্ড জবরজং অনুষ্ঠান।

এর চেয়ে কি রেজিস্ট্রি বিয়ে ভালো ছিল ? কিংবা কালীঘাটে ?

তা বলছি না। কিন্তু প্রসেসটা আরও সিমপ্লিফাই করা যায়।

আর কত সিমপ্লিফাই করা যাবে ? আজকাল পুরোহিতরা অনেক শর্টকাট করে। আমরা তাই একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকে বিয়ের কাজে লাগিয়েছিলাম।

উঃ বাব্বা ! উনি যে কতক্ষণ ধরে মন্ত্র পড়ালেন। তুমি ভীষণ রক্ষণশীল, তাই না ?

বলতে পারো। প্রথা জিনিসটা আমার বেশ লাগে।

কিন্তু এর কোনোও মানে হয় না।

কে জানে ! তবে বিয়ে তো খুব গুরুতর একটা ব্যাপার। এটাকে বেশি হালকা করা ঠিক নয়।

তাই বলে এত জবরজং করাও ঠিক নয়।

অগ্নিভ উদাসীন চোখে দেয়ালের দিকে চেয়ে থেকে বলল, কোনোও অনু-ষ্ঠানেরই তেমন কোনোও মানে নেই। কিন্তু আমার ভালো লাগে।

তোমার একার ভালো লাগাটাই তো একমাত্র ডিসাইসিভ ফ্যাকটার হতে পারে না।

অগ্নিভ এবার ডুধলির দিকে কোণাচে চোখে চেয়ে একটু হাসল, তাহলে শুরু হলো ?

কী ?

কনফ্রণ্টেশন ?

বাঃ, তা কেন ? আমি বলছি—

অগ্নিভ একখানা হাত তুলে ডুধলিকে থামিয়ে দিয়ে বলল, ডুনিয়ার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ডিসিসন নেয় একজন বা তুজন লোক। বাকি সবাই হাত তোলে। রাজনীতি থেকে ধর্ম, সমাজ থেকে পরিবার সর্বত্র।

তা কেন হবে ?

যা হয় তাকে তো অস্বীকার করার উপায় নেই।

তার মানে কি, এর পর থেকে সব ডিসিসন তুমিই নেবে আর আমাকে হাত তুলতে হবে ?

তা বলিনি। কিন্তু যদি তুমি আমার পারসোনালিটির সঙ্গে এঁটে উঠতে না পারো তাহলে আর গতি কি ?

ডুধলি মনে মনে ফুঁসছে, ভাড়াটে বিয়ে-বাড়ির একখানা একটেরে ঘরে মেঝের ওপর চমৎকার বিছানায় আজ তাদের বাসরঘর। রাত একটায় বিয়ে শেষ হয়েছে। এখন বিয়ের প্রথম রাত্রে তাদের একটু ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ। তারা রোমাঞ্চিত শরীরে ও ডুরুডুরু বুকে পরস্পরকে গ্রহণ করার বদলে ডিবেটিং ক্লাব খুলে বসেছে।

ডুধলি দাঁতে বেনারসীর আঁচল ছিঁড়ল। তারপর বলল, তোমার খুব আত্ম-বিশ্বাস তাই না ?

তোমার নেই ?

আছে। বুঝবে। আমি অত সহজে হাত তুলি না।

দেখি হাতখানা।

অগ্নিভ হাত বাড়িয়েছিল। তুধলি তড়িৎ গতিতে হাত সরিয়ে নিয়ে বলল, না।

আমি তোমার হাত ধরলেই বুঝতে পারব তুমি কেমন মেয়ে।

বুঝে দরকার নেই। আমি খুব খারাপ।

খারাপ? কই, তোমার মা-বাবা তো সেকথা বলেন নি।

ওঁরা হয়তো জানেন না বা মিথ্যে কথা বলেছেন।

কতটা খারাপ?

খুব খারাপ। মেয়েরা যা যা করলে তোমাদের চোখে খারাপ দেখায় আমি তার সবকিছুই করেছি। আমার অনেক ছেলে-বন্ধু ছিল। আমি অনেকবার মদ খেয়েছি। সিগারেট আমার খুব নেশা। আমি জিনস পরতে ভালবাসি। আরও শুনবে?

অগ্নিভ স্মিত হেসে বলল, আরও আছে নাকি?

আছে। শুনতে ভালো লাগবে?

অগ্নিভ অনুত্তেজিত ঠাণ্ডা গলায় বলে, শুনি। এখনও তো কিছুই খারাপ বলে মনে হলো না।

সবটা শুনলে তুমি পালাবে।

অগ্নিভ হাত তুলে বলল, থাক। আজকের রাতটা খুব ভালো একটা রাত। আমি বোধহয় নিজের দোষে তোমাকে রাগিয়ে দিয়েছি।

দিয়েছো! এখন আমার মনে হচ্ছে বিয়ের আগে তোমার সম্পর্কে আরও একটু খোঁজ-খবর করা বাবার উচিত ছিল। শুধুমাত্র ক্যারিয়ার দেখে মজে যাওয়া ওদের উচিত হয় নি।

অগ্নিভ হাসল। তবে হাসিটা ভালো ফুটল না। তারপর ধীর স্বরে বলল, খোঁজ-খবর নিলেই কি আর জানা যায়? একটা মানুষের ভেতরকার খবর বাইরের কজনই বা টের পায়? স্বামী-স্ত্রী হিসেবে পঞ্চাশ বছর ঘর করার

পরও একে অন্যকে বুঝতে পারে নি কোনওদিন, এমনও তো হয়।

হয়। আর সেইজন্যই বিয়ের আগে কোর্টশিপ হওয়া ভালো। আমার যে কেন মতিচ্ছন্ন হলো!

অগ্নিভ মাথা নাড়ল, কোর্টশিপে আরও বোঝা যায় না। মানুষ তখন কালার্ড থাকে। চোখে রঙিন চশমা পরলে যেমন হয় তেমনি। শোনো, তুমি এখনও রেগে আছো। রাগ করার মতো আমি এখনও কিছুই বলি নি। আমার যা মনে হয় তাই অকপটে বলার চেষ্ট করেছি। আমারও ভুল থাকতে পারে।

মোটেই না। তুমি প্রাচীনপন্থী, রক্ষণশীল, মীন, গলা চড়ল না ভুধলির, কিন্তু হিংস্র একটা শ্বাসের আঘাতে কথাগুলো কেঁপে কেঁপে গেল।

অগ্নিভ ভুধলির দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। মেয়েটি যে দেখতে সুন্দর তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সুন্দরীদের নিয়েই তো পৃথিবীতে যতেক সমস্যা। সবচেয়ে বড় সমস্যা সুন্দরীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বোকা, নয় জেদী, নয় রাগী নয় তো অহঙ্কারী হয়।

অগ্নিভ বালিশে মাথা রেখে চোখে হাত চাপা দিয়ে বলল, আমি কি রকম তা আমিই সবচেয়ে কম জানি। নিজের ব্যাপারে মানুষ তো অন্ধ। তবে তোমাকে অপমান করার জন্য ইচ্ছে করে আমি কিছু বলি নি।

ভুধলি কিছুক্ষণ দম ধরে চুপ করে রইল। নীরবে সে যে ফুঁসছে তা টের পাচ্ছিল অগ্নিভ। সে একটু ভয়ও পাচ্ছিল। কে জানে এই মেয়েটির সঙ্গে দীর্ঘকাল তার কেমন কাটবে। কিংবা ঠোঁটকাটা ও রাগী মেয়েটা আদৌ তার ঘর করতে পারবে কিনা।

ভুধলি কথা বলছিল না। চুপ করে দু হাঁটু বুকে জড়িয়ে ধরে বসেছিল। চোখ ভরা জল।

অগ্নিভ সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করল না। অপেক্ষা করল। অপেক্ষা করার মতো ভালো কিছু আর নেই।

ভুধলি এক সময়ে উঠল। জল খেল। তারপর দরজা খুলে বাইরে গেল।

অগ্নিভ শুয়ে থেকে থেকে কখন ঘুমিয়ে পড়ল তা নিজেও টের পেল না। ঘুম খুব গভীর নয়। একে উপোসী শরীর, তার ওপর তুধলি কোথায় গেল তা নিয়ে একটু টেনশন ছিল। অগ্নিভের চটকা হঠাৎ ভেঙে গেল। উঠে দেখল, তুধলি ঘরে নেই। দরজাটা খোলা, বাইরে বিয়ে-বাড়ির এঁটোকাঁটা নিয়ে কুকুরের ঝগড়া।। গুনগুন কথার শব্দ। ফুল স্পীড পাখার নীচেও অগ্নিভের গরম লাগছিল।

সে জল খেল। তারপর বাইরে বেরিয়ে এল।

বিয়ে-বাড়ির অবস্থা যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর যুদ্ধক্ষেত্রের মতো শ্রীহীন, ছন্ন-ছাড়া, কটু গন্ধময়। সামনে বেশ বড় বাঁধানো চাতাল। চারদিকে অনেক নিওন আলো জ্বলছে। অল্প কিছু লোক জেগে আছে, ঘোরাঘুরি করছে।

ঘরে গরম লাগছে বুঝি জামাইবাবু?

অগ্নিভ তাকিয়ে দেখল, একটা অল্পবয়সী ছেলে। নিম্নাঙ্গে জিনস, ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। রোগাটে, কালো। মুখে এক গাল হাসি।

অগ্নিভ গরদের পাঞ্জাবিটা খুলে ফেলেছেন। গায়ে গেঞ্জী আছে। সেটা ভিজে গেছে ঘামে। বলল, হ্যাঁ, আজ বড্ড গুমোট। তুমি কে বলো তো?

আমি তুধলিদির মাসতুতো ভাই। অজয়। অজয় ব্যানার্জী।

তুমি এত রাত অবধি জেগে আছো কেন? রাত তো আড়াইটে বাজে।

বিয়ে বাড়িতে আবার রাত কী! খেয়ে উঠেছি তো দেড়টায়। তারপর আড্ডা দিচ্ছি কজন মিলে। তাসটাস চলছে। তুধলিদি মাইণ্ড না করলে আপনিও আমাদের সঙ্গে বসতে পারেন। ওই কোণের ঘরে।

বাতাসে সামান্য একটু অ্যালকোহলের ঝাঁজ পাচ্ছিল অগ্নিভ। প্রথমটায় ঠিক বুঝতে পারে নি। এখন পারল। ছেলেটা একটু পান টান করেছে। আজকাল এই বয়সের ছেলেদের বেশ প্রিয় অভ্যাস।

অগ্নিভ বলল, ঘরে বসলে আর বাইরে এলাম কেন? একটু ঘুরে আসি বাইরে থেকে।

যান। আপনার তরফের কেউ আছে এখানে?

অগ্নিভ একটু হাসল। মাথা নেড়ে বলল, না। থাকারই নিয়ম। কিন্তু আমি মানা করে দিয়েছিলাম।

অগ্নিভ বাইরের দিকে পায়ে পায়ে এগোচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটাও এল।

আচ্ছা জামাইবাবু

বলো।

আপনার কোম্পানিতে লোক-টোক নেয় না।

অগ্নিভ হাসল, নেবে না কেন ? দরকার হলেই নেয়।

আপনি খুব বড় পোস্টে আছেন, তাই না ?

মোটামুটি। কেন বলো তো ! আমি কিন্তু চাকরি দেওয়ার মালিক নই।

আচ্ছা জামাইবাবু, সকলেই এই কথাটা বলে কেন বলুন তো !

কোন্ কথাটা ?

এই যে, আমি চাকরি দেওয়ার মালিক নই। যে কোনও ঘ্যাম লোককে অ্যাপ্রোচ করলেই ওই এক কথা বলে।

অগ্নিভ একটু হাসল। তারপর ধীর স্বরে বলল, তারা হয়তো সত্যিই বলে।

অজয় আপন মনেই বলল, আমরা পাঁচ ভাই। চারজন বড় বড় চাকরি করে। প্রত্যেকেই ওয়েল সেট। আমি সবচেয়ে ছোটো। আমারই কিছু হলো না। বি-কম পাশ করে বসে আছি।

লেগে থাকো। হয়ে যাবে।

আপনি আমাকে অ্যাভয়েড করছেন জামাইবাবু! সকলেই অবশ্য করে।

আরে না।

এই ছোকরার সঙ্গে বকবক করতে অগ্নিভর ভালো লাগছিল না। বিশেষ করে চাকরির উমেদারদের সে একটু এড়িয়ে চলে। মনটাও ভালো নেই। কিন্তু অজয় তার সঙ্গ ছাড়ল না। ফটকের কাছে এসে দুজনে দাঁড়াল। বাইরে নির্জন গড়িয়াহাট রোড। রাত্রে, নির্জন বলেই বোধহয় বিশাল বড় দেখাচ্ছে রাস্তাটাকে। খোলা জায়গায় মৃদু একটু হাওয়া বইছিল।

আজ বিয়ে বাড়িতে একটা ইন্টারেস্টিং লোক ঢুকে পড়েছিল, জানেন ?

অগ্নিভ আকাশের দিকে চেয়েছিল। নির্মেঘ আকাশে তুবড়ির মতো তারার ফোয়ারা। অগ্নিভ আকাশ দেখতে ভালবাসে। ঊর্ধ্বমুখ হয়ে সে উদাস গলায় বলল, তাই নাকি ?

লোকটাকে প্রথমে চারশ বিশ বলে মনে করা হয়েছিল। ভূটিয়াদা তো এই মারে কি সেই মারে। আর ভুটিয়াদা যা মস্তান।

লোকটা কী করেছিল ?

লোকটা ঢুকেই অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল।

তারপর ?

তারপর অবশ্য জানা গেল যে লোকটা আসলে একজন ইনভাইটি, তুধলি-দির চেনা।

তুধলির নামে অগ্নিভ একবার অজয়ের মুখের দিকে তাকাল। মুখে বলল, ও! তাহলে আর ইন্টারেস্টিং কী হলো ?

লোকটাকে কেউ চিনতে পারছিল না। সবাই ধরে নিয়েছিল, হয় বিনি মাগনা খ্যাঁট মারতে ঢুকেছে, নয়তো আরও খারাপ মতলব আছে। খুব কেলো হয়েছিল। ভুটিয়াদা লোকটাকে স্পট থেকে তুলে নিয়ে না গেলে কেলো একটা হতোই। বর নিয়ে বরযাত্রীরা এসে পড়ল ইনসিডেন্টটার দশ মিনিট বাদে। আর যে প্যাসেজ দিয়ে আপনারা এন্ট্রি নিলেন সেখানেই লোকটা চেয়ার উল্টে পড়েছিল।

লোকটি আসলে কে ?

অজয় হাত উল্টে বলল, কে জানে। নাম নন্দন সান্যাল। গর্চা সেকেণ্ড বাই লেনে থাকে।

অগ্নিভ ভারী অবাক হলো। অজয়ের দিকে চেয়ে বলল, নন্দন সান্যাল তো খুবই ফেমাস লোক !

ফেমাস ! কই, কখনও নাম শুনি নি তো !

নাম শোনো নি ? আশ্চর্য !

লোকটা কিসে ফেমাস জামাইবাবু ?

অগ্নিভ উদাস গলায় বলল, পাবলিকের অবশ্য তার নাম জানবার কথা নয়। নন্দন সান্যাল বিরাট বড়লোক। একসময়ে নন্দন চমৎকার ক্ল্যাসিক্যাল গাইত, ছবি আঁকত। ছিল ভালো একজন আর্টিস্ট আর ডিজাইনার। কালেকটার হিসেবেও নন্দন খুব নামডাকওয়ালা লোক। বয়স বেশী নয়, এখনও ব্যাচেলার। নন্দনের সঙ্গে অনেকেরই খুব খাতির আছে। দেশের জ্ঞানী গুণী প্রায় সবাই তাকে চেনে। শোনা যায় প্রাইমমিনিস্টারও তাকে পারসোন্যালি চেনেন।

বলেন কি ! এ তো ঘ্যাম লোক।

হ্যাঁ। কিন্তু লোকটার একটা দোষ আছে।

আরে ওসব লোকের একটু আধটু দোষ ধরতে নেই।

দোষটা খুব একটু আধটু নয়। বেশীরকম।

কী দোষ জামাইবাবু ?

লোকটা নিজে নানারকম নেশা করে।

মদ ?

মদ গাঁজা ভাঙ, ইদানীং ড্রাগসও। নিজে নেশা করে, অন্যকেও ধরায়।

তাই নাকি ?

নন্দনের সঙ্গে তুধলির চেনা আছে তাহলে ?

৩

তুধলি ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই আড়াল খুঁজেছিল। কনের সাজে বাইরে ঘুরে বেড়ালে লোকে প্রশ্ন করবে। অথচ এই লোকটার সঙ্গে তার একটুও আর সময় কাটাতে রুচি হচ্ছে না।

তার জীবন এমন একটা লোকের সঙ্গে জড়িয়ে গেল আজ, যার সঙ্গে কোনোদিনই তার মিলবে না। মেলাতে চায়ও না তুধলি। এমন কিছু ব্যাপার নয়। তার ক্লাসমেটদের মধ্যে অন্তত তুজন আছে যারা বিয়ের ছমাস বা এক বছরের মধ্যেই ডিভোর্স করেছে। মা বাবার সঙ্গে একটু ঝামেলা হবে ঠিকই. কিন্তু সেটুকু পোয়াতে হবে। উপায় কি ?

ভাগ্য ভালো, ঘর থেকে বেরোতেই কারও সঙ্গে চোখাচোখি হলো না। উঠোনে আলপনা আঁকা যজ্ঞস্থল, ঘট-ফুল-ছাই পড়ে আছে। ফটকের সামনে মঙ্গল-কলস। কত টুনি বাল্‌ব এখনও জ্বলছে। শাস্ত্রমতে বিয়ে, চার ঘণ্টা যজ্ঞ, বিস্তর সংস্কৃত মন্ত্রের ফাটাফাটি। তবু বিয়ের রাতেই তুধলিকে বাসর-ঘর ছেড়ে পালাতে হচ্ছে।

ডানধারে একটা প্যাসেজ, সেখানে কিন্তু তেমন আলো নেই। তুধলি দ্রুত পায়ে অন্ধকারের দিকে চলল। প্যাসেজের শেষে একটা সিঁড়ি, তুধলি জানে, এবাড়ির দোতলা বলে কিছু নেই। সিঁড়ি বেয়ে সোজা ছাদে চলে এল তুধলি। ছাদ মানে ন্যাড়া ছাদ। অসম্পূর্ণ বাড়ি, তবে বহুকাল ধরে এরকমই আধখ্যাঁচড়া পড়ে আছে। এই ভাড়াটে বিয়ে-বাড়িতে আরও কয়েকটা বিয়ে উপলক্ষে এসে গেছে তুধলি। মোটামুটি চেনে, শুধু বিয়ে বা ওই জাতীয় অনুষ্ঠানের জন্যই ভাড়া দেওয়া হয়। বসবাসের কোনোও ছাপ

নেই বলে এই সব বাড়ির একটা নৈর্ব্যক্তিক উদাসীন আবহ আছে।

ছাদটা বড়, প্রয়োজনে এখানে প্যাণ্ডেল করে খাওয়ার ব্যবস্থা হয়। তুধলির বিয়েতে তেমন প্রয়োজন দেখা দেয় নি। বেশ পরিষ্কার, ফাঁকা ছাদ। আকাশে একটু জ্যোৎস্না। একধারে জলের ট্যাংক উঁচু কংক্রিটের ওপর বসানো, তার নিচে গাঢ় ছায়া।

তুধলি সেই মোলায়েম ছায়ার নীচে গিয়ে দাঁড়াল। আর এতক্ষণে নিজেকে ভারী বোক-বোকা লাগল তার। কংক্রিটের একটা থামে হেলান দিয়ে শুনতে পাচ্ছিল মাথার ওপর জলের ট্যাংকে গভীর বিষণ্ণ শব্দে জল পড়ছে। বোধহয় জল ফুরিয়ে গিয়েছিল, তোলা হচ্ছে। আর জলের ওই শব্দের মধ্যে ও কি সঙ্গীত ? একটু একঘেয়ে, তবু সুরেলা।

তুধলি হাঁটু মুড়ে বসল। জীবনে সে বেনারসী খুব বেশিবার পরে নি, এত গয়না তো কখনোই নয়। মুখে এখনও শুকিয়ে যাওয়া চন্দনের ফোঁটা চড়চড় করছে। হাত পা নাড়লেই গয়নার নানা ধাতব শব্দ বেজে উঠছে। জীবনে যে কত ভার চেপে বসল এ যেন তারই প্রতীক। বেনারসীর খসখস সারাক্ষণ অস্বস্তি দিচ্ছে।

তুধলি ভাবতে বসল, এতটা না করলেই হতো। লোকটার সঙ্গে তার বনি-বনা হবে কিনা তা কি কয়েক মিনিটের আলাপেই বোঝা সম্ভব ? হয়তো লোকটা একটু বোকা, সেকেলে। বোকা পুরুষ খারাপ নয়, তবে সেকেলে হলে একটু মুস্কিল। কিন্তু তুধলি তো বোকা নয়। সংসার একটা সাদামাটা মোটরগাড়ি, তুজন মাত্র সওয়ারি। কে ড্রাইভারের সীটে বসবে। অর্থাৎ কার হাতে থাকবে স্টিয়ারিং হুইল তাই নিয়েই যা-কিছু আকচাআকচি। ধৈর্য ধরলে তুধলিই হয়তো ড্রাইভারের সীট দখল করতে পারবে। অভি-মান করার মানেই হয় না।

ছাদে একটু হাওয়া আছে। এই গরমের রাতে ভারী সুন্দর একটু হাওয়া। শরীর জুড়িয়ে যায়। কিন্তু মন কি জুড়োয় ? কত কি হওয়ার ছিল তার, কত কি করার ছিল। আর কি পারবে ? মাত্র একুশ পেরিয়ে বাইশে পা,

অমনি কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসল কে এক অগ্নিভ। নামেরই যা বাহার, আসলে ওর নাম গোবর্ধন বা হরিপদ হলেও ক্ষতি ছিল না।

ছাদ থেকে উঠোনটা দেখা যায়। বিয়ের জায়গাটার ওপর একটু ঢাকনা, বাদবাকিটা খোলা। পাকা উঠোন। ধু-ধু আলো জ্বলছে, ভাড়াটে বাড়ি, পেশাদার পুরুত, অংবং মন্ত্র, এই নাকি বিয়ে ? এত সহজে হয়ে গেল এত বড় একটা ব্যাপার। এক গাদা লোক এসে কাঁড়িখানেক করে খেয়ে গেল। আর কী হলো ?

চুপচাপ বসে রইল তুধলি। মাথার ওপর ট্যাংকে জল পড়ার অবিরল শব্দ, বসে থেকে থেকে চোখ জ্বালা করতে লাগল অনিদ্রায়। বেশ অম্বল হয়েছে, টের পাচ্ছে তুধলি। বুকে জ্বালা। বসে থেকে থেকে এক সময়ে মাথাটা নেমে এল হাঁটুর ওপর। চোখ বুজে এল ঢুলুনিতে।

অনভ্যস্ত ভঙ্গিতে অনেকক্ষণ বসে থাকার ফলেই ঘাড় টনটন করছিল। চটকা ভেঙে 'উঃ' করে ঘাড়ে হাত বোলাল তুধলি, গয়নার শব্দ হলো টুংটাং।

তখনই দেখতে পেল অগ্নিভকে। অজয়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ফটকের দিকে এগোচ্ছে। তাকেই খুঁজছে কি ? খুঁজুক, লোকটাকে তার পছন্দ হচ্ছে না। একদম নয়।

অগ্নিভর চেহারাটা মোটামুটি ভালো। কিন্তু ভালো চেহারার প্রতি আকর্ষণ মেয়েদের থাকলেও সেটাই একমাত্র ব্যাপার তো নয়।

জ্বালাভরা চোখে চেয়ে রইল তুধলি। অগ্নিভ ধীরে ধীরে চোখের আড়ালে চলে গেল।

তুধলি উঠল এবং ধীর পায়ে নিচে নেমে এল। ঘরে ঢুকে সে দ্রুত হাতে বেনারসী ছেড়ে একটা তাঁতের শাড়ি পরে নিল। ভারী গয়নাগুলো খুলে রেখে দিলো স্যুটকেসে। তারপর বেরিয়ে এল প্যাসেজে।

এ বাড়ি থেকে বেরোনোর আর একটা পথ আছে। খুবই নোংরা গলি। বিয়ে বাড়ির এঁটোকাঁটা সেখানেই ফেলা হয়। তবু বেরোনো যায়।

কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে দ্বিধাগ্রস্ত দুধলি একটু ভাবল। তারপর ভাবনা-চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে বারান্দায় বেরিয়ে দ্রুত পায়ে গলিটার মুখে পৌঁছে গেল। কেউ দেখে নি তাকে।

গলিটা নোংরা। পিছলও বটে। কিন্তু বিনা দুর্ঘটনায় দুধলি পেরিয়ে এল গলিটা। যে-রাস্তায় পড়ল সেটা গড়িয়াহাট রোড নয় বটে, কিন্তু একটু ঘুরে সেটা গড়িয়াহাট রোডেই পড়েছে। এত রাতে একা এরকম নির্জন রাস্তায় চলার অভিজ্ঞতা নেই দুধলির। কিন্তু এরকম অভিজ্ঞতাও তো জীবনে দরকার। বিপদ ভাবলেই বিপদ।

দুধলি ধীর পায়ে বেরিয়ে এসে যথাসম্ভব স্বাভাবিক গতিতে হেঁটে গিয়ে গড়িয়াহাট রোডে পড়ল। বাঁ দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে সে তার বিয়ে বাড়িটা দেখতে পেল। দেখল, ফটকে দুজন লোক দাঁড়িয়ে গল্প করছে। অগ্নিভ আর অজয়। দুধলি দ্বিতীয়বার তাকাল না।

কোথায় যাবে দুধলি? তার এত বন্ধু, এত চেনা জানা তবু কারও কথাই চট করে মনে পড়ল না। একটু ভাবতে হলো। কাছাকাছি কে আছে? আচমকাই নয়নার কথা মনে পড়ে গেল তার। মিনিট পাঁচেক উত্তরমুখো হাঁটলেই ডানধারের রাস্তা। নয়নার অ্যাপার্টমেণ্ট বোধহয় ছয় কি সাত নম্বর বাড়ি। বহুদিন আগে এসেছিল একবার। তখন নয়নার বাবা বেঁচে ছিলেন। বেশ ভালো অবস্থা ছিল, তারপর ক্যানসার হয় ভদ্রলোকের। নয়নাদের প্রায় যথাসর্বস্ব চলে যায় তাঁর চিকিৎসায়। ভদ্রলোক বাঁচেন নি। নয়না পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। শোনা গিয়েছিল তারা অ্যাপার্টমেণ্টটাও বিক্রি করে দেবে। বারুইপুরে চলে যাওয়ার একটা কথা শুনেছিল দুধলি। এসব প্রায় আট দশ মাস আগেকার কথা। একসময়ে নয়নাই ছিল দুধলির সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। যদি নয়নারা এখনও ওই বাড়িতে থেকে থাকে তবে দুধলির রাত কাটানোর পক্ষে ওর চেয়ে ভালো আশ্রয় আর হয় না। নয়না আর তার মা ছাড়া আর কেউ নেই ওদের ফ্ল্যাটে, তিনখানা ঘর। বিয়েতে নয়নাকে নেমন্তন্ন করা হয় নি। যোগাযোগের অভাব। হয়তো

যথা সময়ে মনেও পড়ে নি নামটা।

তুধলি হাঁটতে লাগল। পথ নিরাপদ। ঘটনাশূন্য। নির্জন। তু'একটা বাড়িতে আলো জ্বলছে। গাড়ি-টাড়ি চলছে না। তবু অনভ্যস্ত মধ্য রাতে তুধলি যা জোরে হাঁটছিল তাতে পাঁচ মিনিটের পথ তিন মিনিটে পার হয়ে এল। নয়নাদের বিশাল অ্যাপার্টমেন্টের সামনে এসে দেখলে মস্ত গ্রিলের ফটকে কষে তালা দেওয়া। ভেতরে তুটো খাটিয়ায় তুজন লোক অঘোর ঘুমে। অনেকগুলো গাড়ি ঠাণ্ডা মেরে আছে।

কিভাবে এদের জাগাতে হবে তা তো জানে না তুধলি। জাগানো উচিত হবে কিনা তাও বুঝতে পারছে না। উপরন্তু নয়নারা যদি এখানে না থেকে থাকে তাহলে তুধলির অ্যাডভেনচারটাই মাটি হবে। ফিরে যেতে হবে বিয়ে-বাড়ির পিঁজরাপোলে।

দারোয়ান! এই দারোয়ান! গেট নাড়া দিয়ে ডাকল তুধলি। বেশ কয়েক-বার ডাকতে হলো।

ভাগ্য ভালো, একটা লোক উঠল। তারপর তার দিকে চেয়ে একটু অবাক হয়ে বলল, কাকে চান?

নয়না দত্ত, সাত তলায়।

আপনি কোথা থেকে আসছেন?,

আমি ওর বন্ধু। ভীষণ বিপদে পড়ে এসেছি।

এত রাতে কাউকে অ্যালাউ করা যায় না। আপনার নাম কি?

দরজাটা খুলবেন তো!

আগে নাম ঠিকানা বলুন।

নয়নারা এখানে আছে তো!

আছে।

আমার নাম শিঞ্জিনী মজুমদার। বললেই চিনবে।

লোকটা খুব অনিচ্ছের সঙ্গে উঠল। ফটক খুলল। তারপর বলল, একটু দাঁড়ান, আমি সঙ্গে যাবো।

তাই নিয়ম নাকি ?

হ্যাঁ। ফ্ল্যাটবাড়িতে কত মতলবে কত লোক আসে।

একটু এগিয়ে লিফটের কাছে দাঁড়িয়ে রইল ত্বধলি। লোকটা ফটক বন্ধ করে এল। অন্ধকার লিফট চালু করল।

সাত তলায় এসে নয়নাদের দরজায় বেল টেপবার আগে বলল, আপনার সঙ্গে ভালো চেনা তো!

খুব ভালো।

বেল টেপবার পর অন্তত মিনিটখানেক পার হলো। তারপর দরজার ওপাশ থেকে কতক মেয়েলী গলা পাওয়া গেল, কে ?

লোকটা বলল, আমি নারায়ণ, আপনাদের কাছে একটি মেয়ে এসেছে। শিঞ্জিনী, চেনেন ?

কে সিঞ্জিনী ?

ত্বধলি এগিয়ে গিয়ে বলল, মাসিমা, আমি ত্বধলি, নয়নার বন্ধু।

দরজাটা সামান্য খুলে গেল। নয়নার মা অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে বললেন, তুমি! এত রাতে কোথা থেকে এলে ? কী হয়েছে বলো তো ?

নয়না কি বাড়িতে আছে ?

আছে। ওর তো গাঢ় ঘুম।

আমি একটু বিপদে পড়ে এসেছি মাসিমা।

ভদ্রমহিলা দরজাটা ভালো করে খুলে দিয়ে বললেন, এসো। নারায়ণ, তুমি যেতে পারো। এ আমাদের চেনা মেয়ে।

ঠিক আছে, বলে লোকটা চলে গেল।

ভদ্রমহিলা দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বললেন, কী হয়েছে বলো তো!

আমি আজ রাতে এখানে একটু থাকবো মাসিমা।

নয়নার মা একটু অবাক হয়ে ত্বধলির দিকে চেয়ে থেকে বললেন, তোমাকে একটু অদ্ভুত দেখাচ্ছে, মুখে চন্দনের ফোঁটা, খুব সাজ করা খোঁপা। আজ তোমার কোনোও অনুষ্ঠান ছিল ?

সব বলছি মাসিমা, নয়নাকে একটু ডাকা যায় না ?

বোসো, ডাকছি।

বলে উনি চলে গেলেন। মিনিট পাঁচেক সময় পেল তুধলি। কী বলবে তা ভেবে সাজিয়ে নিল মনে মনে।

ভেতরের ঘরে নয়নাকে ডাকছেন ওর মা, তুধলি শুনতে পাচ্ছিল। খুব আদুরে ডাক, যেমনটি তার নিজের মা তাকে ডাকে। মাকে কি খুব দুঃখ দেওয়া হলো ? বাবা কাল সকালে হার্টফেল করবে না তো !

নয়না উঠে এল। পরনে ছাপ ছক্করওলা নাইটি, চোখ ভরা ঘুম, আর বিস্ময়।

তুই ,!

তুধলি ম্লান একটু হেসে বলল, পালিয়ে এসেছি।

বাড়ি থেকে ?

তা বলতে পারিস। মাত্র কিছুক্ষণ আগেই আমার বিয়ে হয়েছে।

বিয়ে !

খুব অবাক হলি তো ! তোকে নেমন্তন্ন করি নি, কারণ তোর কথা আমার মনেই ছিল না। যেই মনে পড়ল অমনি আমি ছুটে এলাম সেই তোর কাছেই।

নয়না ধপ করে সোফায় তার পাশে বসে পড়ল, ধ্যাৎ, নেমন্তন্নের কথা রাখ তো ! কী হয়েছে খুলে বল।

তুই আগে চোখে জল দিয়ে আয়।

আসছি দাঁড়া। 'উঃ' কী দারুণ ! অ্যাডভেঞ্চার করেছিস তো ! নিরীহ এবং ভালো মানুষ ভদ্রমহিলা বিষণ্ণ মুখে এসে দাঁড়ালেন। চায়ের জল চড়িয়ে এসেছি। তুমি আর কিছু খাবে ?

না। চায়েরও দরকার ছিল না। একটু শুধু জল খাবো।

ওই তো জগে রয়েছে, খাও। পালিয়ে আসার কথা কী বলছিলে ?

ঢক ঢক করে অনেকটা জল খেল তুধলি। সে খুব জল খায়। ডাক্তাররা

বলে, বেশি তেষ্টা অম্বলের লক্ষণ।

নয়না কোনোও রকমে মুখে একটু জল ছিটিয়ে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতেই এসে সোফায় বসল।

মা, তুমি ও ঘরে যাও না। তুধলির প্রাইভেট কথা আছে।

তুধলি তাড়াতাড়ি বলল, না মাসিমা, প্রাইভেট নয়। আপনারও শোনা উচিত, বসুন।

ভদ্রমহিলা দীর্ঘশ্বাসের মতো একটা শব্দ করে বললেন, আমার না শুনলেও চলবে।

না, শুনতে হবে মাসিমা। আমার লুকোনোর কিছু নেই।

তাহলে দাঁড়াও, চা নিয়ে আসি।

উনি চলে যেতেই নয়না তুধলিকে খোঁচা দিয়ে বলল, বল না রে। খুব ইন্টারেস্টিং কিছু ? পণ নিয়ে নাকি ?

না। ওরা পণ নেয় নি। এমন কি পাত্র নিজে ঘড়ি বা আংটি অবধি নেয় নি।

নেয় নি !

বলিস কি ? তাহলে তো ভালই রে।

হয়তো ভালো।

হেঁয়ালি করিস না।

একটুও হেঁয়ালি করছি না। মাসিমা আসুক বলছি।

নয়না দেখতে একটু ডলপুতুলের মতো। ভারী আহ্লাদী আর ঢলঢলে। রংটা মাজা, বব করা চুল। শরীরটা একটু মোটার দিকেই।

তুধলি বলল, মুটিয়েছিস কিন্তু।

স্রেফ জল খেয়েও ফ্যাট হচ্ছে।

এ বাড়ি তোরা ছাড়িস নি তাহলে। আমার তো ভয় হচ্ছিল, ফিরেই যেতে হবে বুঝি। এত রাতে তাহলে যে কোথায় যেতাম !

তোর বরটা পাগল নয় তো !

একরকম পাগলই।

কিরকম পাগল?

বাতিকগ্রস্ত।

নয়নার মা চা নিয়ে এলেন। ভদ্রমহিলার প্রতিটি কাজেই নিরতিশয় যত্নের ছাপ। চা একটুও চলকায় নি, আলাদা প্লেটে নোনতা বিস্কুট।

খাও।

চায়ে আমার নেশা নেই। তবু খাচ্ছি।

রাত জাগলে একটু চা খাওয়া খারাপ নয়। আমার তো নানা চিন্তায় মাঝে মাঝে ঘুম আসে না। তখন রাতে উঠে উঠে চা খাই।

কিসের চিন্তা মাসিমা?

নয়নার বাবা চলে যাওয়ার পর থেকেই তো আমরা দুটি অসহায় প্রাণী। কেউ তো নেই আমাদের। কতো চিন্তা হয়। এসব তুমি বুঝবে না।

মা এমনি এমনি ভাবে রে। আসলে দুশ্চিন্তা করতেই অনেকে ভালবাসে।

তুই পড়া ছাড়লি কেন নয়না?

ছেড়েছি কে বলল? গত বছর বাবার অসুখ হওয়ায় পড়াটা ডিস্টার্বড হয়ে গেল। ড্রপ দিলাম। ঘরে বসে এখন পড়ি। কিন্তু পড়ে কী হবে বল তো! অনার্স ছিল না, এম-এতে ভর্তি হতে পারবো না। লেখাপড়ায় তেমন মাথাও তো নেই। আমার বাবাটা যে কেন বেঁচে থাকল না!

নয়নার গলাটা ভার হয়ে আটকে গেল। চোখে জল এসে গেল চোখের পলকে।

নয়নার মা একটু দূরে একটা কেঠো চেয়ারে বসে বললেন, তোমরা চা খেয়ে নাও। জুড়িয়ে যাচ্ছে।

খাচ্ছি মাসিমা। নয়না নে রে।

নয়নার মা একটা লম্বা কাঁচের গেলাসে অনেকটা চা নিয়ে বসেছেন। বললেন, কোথা থেকে পালালে দুধলি?

সে একটা মজার কাণ্ড মাসীমা। পালিয়েছি বটে, কিন্তু নিজেকে ঠিক

জাস্টিফায়েড করতে পারছি না। যে লোকটার কাছ থেকে পালিয়েছি সে এমন কিছু খারাপ লোকও নয়।

তোমার কি বিয়ে হলো ?

হ্যাঁ, কী করে বুঝলেন ?

বোঝা যায়।

কী করে যায় মাসিমা ?

সাজগোজ, মুখের চেহারা।

শুধু এই ? আর কিছু নয় ?

কি জানি মা। আরও কিছু আছে নিশ্চয়ই। বিয়ের লক্ষণ আছে। তবে যদি পড়া ধরো তো পারব না। অত বিচার-বুদ্ধি তো নেই। তা পালালে কেন ?

লোকটাকে পছন্দ হলো না ?

তাহলে বিয়ে করলে কেন ?

করেছি আর কোথায় ? হয়েছে। মা বাবার পছন্দের ছেলে।

পাত্র কি খারাপ ?

খারাপ বললে অন্যায় হবে। বড় চাকরি, বিরাট বিলিতী ডিগ্রি, খুব উদার।

তাহলে ?

কেন যেন মনে হলো, লোকটার সঙ্গে আমার বনবে না।

কাজটা ভেবেচিন্তে করো নি তাই না ?

এখন কী হবে ? নয়নার মাকে সত্যিকারের উদ্বিগ্ন দেখাল।

যা হওয়ার হবে। কাল সকালে ঠিক করব। আজ আমি আর নয়না গল্প করে রাতভোর কাটিয়ে দিই।

নয়নার মা শান্ত মানুষ। কিন্তু এখন যেন একটু উত্তেজিত। বললেন, তা কি হয় ? তোমার তো খোঁজ হবে।

সেইটেই তো চাইছি। খুঁজুক।

তারপর যে ঢিঢি পড়ে যাবে। অনেক অনেক রকম সন্দেহ করবে। একটু

খামখেয়ালীর জন্য যে অনেক ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হবে তোমাকে। মেয়ে হয়ে জন্মেছো, সেটাই তো অভিশাপ।

ভুধলি সোজাসুজি ভদ্রমহিলার চোখে চোখ রেখে বলে, তা কেন হবে মাসিমা ? আমি মেয়ে হয়ে জন্মে কিছুই খারাপ করিনি। লোকটা চ্যাটাং চ্যাট্যাং কথা বলছিল বলে একটু শিক্ষা দিচ্ছি। এমনও হতে পারে যে লোকটাকে আমি ডিভোর্সই করব।

ডিভোর্স ! ডিভোর্স ! বলে কেমন যেন হতভম্ব হয়ে নয়নার মা বললেন, এসব কী বলছো !

নয়না হঠাৎ উঠে মায়ের কাছে গিয়ে বলল,'যাও না মা, গিয়ে শুয়ে থাকো। ভুধলি একটু আপসেট, বুঝতেই তো পারছো। তুমি যাও, আমরা বসে কথা বলি।

কিন্তু ও যে এখানে থাকবে।

তাতে কী হলো ?

সকালে যে থানা-পুলিশের কাণ্ড হবে। কদিন আগে যা হয়ে গেল !

হলে হবে। ভেবো না, আমি তো আর বন্ধুকে তাড়িয়ে দিতে পারি না।

ভুধলি উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছিল রে নয়না ?

ওঃ, সে একটা বাজে ব্যাপার। আমাদের একটা কাজের মেয়ে ছিল। সতেরো আঠারো বছর বয়স। এই হাউসেই দোতলার মিস্টার সিন্‌হার ড্রাইভারের সঙ্গে হঠনাচিং করতো। মা একদিন খুব বকেছিল। তাইতে ড্রাইভারটা এসে আমাদের শাসায়। অনেক কাণ্ড।

তারপর কী হলো ?

মিস্টার সিন্‌হাকে এই নিয়ে সবাই খুব হেকেল করে। ফলে সিন্‌হা সাহেব তাঁর ড্রাইভারকে তাড়িয়ে দেন। আর মেয়েটা, ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে সুইসাইড করে।

মাই গড ! এখনও প্রেমের জন্য সুইসাইড ?

হ্যাভনটসদের মধ্যে ওসব ফিলিং এখনও আছে। রোমান্টিক এসকেপ।

কিন্তু তারপর পুলিশ আমাদের যে কী ভীষণ হেকেল করেছে তা ভাবতে পারবি না। ভাগ্যিস এই হাউসে দু'জন ব্যারিস্টার আছেন। তাঁরা আর সবাই মিলে চেষ্টা-চরিত্র করে কেসটা মিটিয়ে নেয়। পুলিশ কেস কী জিনিস তা তো জানতাম না। এবার ভালো করে জানলাম। জেরার ওপর জেরা, সকাল বিকেল যখন তখন থানা থেকে তলব। দশবার করে বাড়ি সার্চ, তার ওপর আদালতে ছোটাছুটি, ওঃ কী যে গেছে। আমরা বোধহয় দুমাস ঘুমোয় নি। তা ছাড়া মেয়েটার বাড়ির লোক এসে কত কী যে বলে গেছে তার ঠিক নেই। পাড়ার মস্তানরাও জুটে গিয়েছিল। খবরের কাগজে পড়িস নি? আমার আর মায়ের নামও বেরিয়েছিল কয়েকবার।

হয়তো মিস করেছি।

নয়না মুখ টিপে হেসে বলল, সেই ঘটনার পর থেকে আমাদের কেউ কোনোও সোশ্যাল গ্যাদারিং-এ ডাকে না। আমরাও মাইণ্ড করি না। আফটার অল আমরা তো ভিলেন।

দুধলি মাথা নেড়ে বলল, বিশ্বাস করো, আমি এই ঘটনার বিন্দু বিসর্গও জানতাম না। যদি জানতাম তবে তোর কথা আমার ঠিক মনে পড়ত আর তোকে নেমন্তন্ন করতেও ভুল হতো না।

তোর কথা বিশ্বাস করব না কেন? আমি ঠাট্টা করছিলাম। তবে সেই থেকে মা খুব ভীতু হয়ে গেছে। আজকাল আমাদের বাড়িতে আর চব্বিশ ঘণ্টার ঝিও নেই।

দুধলি একটুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, মাসিমা ঠিকই বলেছেন রে নয়না। তোদের বাড়িতে আমার থাকা উচিত নয়।

নয়না অবাক হয়ে বলে, কেন?

পুলিশ যদি সত্যিই আসে?

নয়না খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বলল, একটা কথা সত্যি করে বলবি দুধলি?

কী বলব?

তুই সত্যিই কেন পালিয়ে এসেছিস ! তোর কথা আমার একটুও বিশ্বাস হচ্ছে না।

কেন বল তো ! বিশ্বাস না হওয়ার মতো কী বলেছি আমি ?

এত সামান্য কারণে কেউ বিয়ের রাতে পালিয়ে আসে না। বরের সঙ্গে তো তোর ঝগড়াও হয় নি।

ঝগড়া ! ঝগড়া কি শুধু মুখে হয় ? মনের সঙ্গে মনের ঝগড়া হয় না ? রুচির সঙ্গে রুচির ? কালচারাল ব্যাকগ্রাউণ্ডের সঙ্গে কালচারাল ব্যাক-গ্রাউণ্ডের ?

ওসব শক্ত কথা ভাই, আমি ঠিক বুঝি না।

কেন বুঝবি না ? একটা লোককে আমি অ্যাকসেপ্ট করতে পারছি না। ইজনট ইট এনাফ ?

জবাবটা নয়নার মা দিলেন, না এনাফ নয় তুধলি। লোকটার সঙ্গে তোমার বনিবনা হয় কিনা তা দেখার জন্য আর একটু সময় দেওয়ার দরকার ছিল।

তাহলে আমি উঠছি মাসিমা।

ফিরে যাবে তো ?

দেখি, যেতে যেতে ভাববো।

নয়না তার হাতটা ধরে বলল, কী পাগলামি হচ্ছে ? থাক না আজ রাত্তিরটা। ভোর হলেই আমি নিজে, গিয়ে তোকে পৌঁছে দিয়ে আসবো।

না আমি একা পারবো। একাই তো এসেছি।

ফিরে যাবি তো ?

যেতে যেতে ভাবব।

আশ্চর্যের বিষয়, নয়না বা তার মা আর তেমন জোর করলো না।

তুধলি লিফট না পেয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো।

বড় ফটক বন্ধ, কিন্তু বেরোবার সময় তুধলি দেখল, বড় ফটকের ডান ধারে তলার দিকে ছোটো একটা দরজা রয়েছে। সেটায় তালা নেই।

তুধলি নিরাপদে বেরিয়ে এলো।

৪

নন্দন কেন এসেছিল জানো ?

সোমলতা পাশ ফিরে বললেন, আমার মনটা আজ ভালো নেই। একটু চুপ করবে ?

আমি তো সারা জীবন চুপ করে রইলাম।

তাহলে আজকের রাতটাও থাকো।

চুপ করে থাকলে কী হবে জানো ?

কী হবে ?

টেনশনে আমার হার্ট অ্যাটাক হয়ে যেতে পারে।

টেনশনের কী হলো ?

মেয়েটা পরের ঘরে যাচ্ছে। চারদিকে বধূ নির্যাতন, বউ পোড়ানো, সুই-সাইড, টেনশন হবে না। ওরা কিরকম লোক তা তো আর জানি না। তার ওপর নন্দন।

এটা তো নতুন নয়। তোমার সবকিছু নিয়েই সবসময়ে টেনশন হয়।

হয় মানছি। আমার টাইপটাই ওরকম। কিন্তু ইউ বিয়িং মাই ওয়াইফ তোমার উচিত তোমার টেনশনটাকে রিলিফ দেওয়া।

আমি কী করব বলতে পারো ?

শুধু বলো, নন্দনকে কে নেমন্তন্ন করেছিল।

আমি করি নি।

তুধলি তো ওকে চেনেও না। তবু শুনলাম ভুটিয়ার কাছে বলেছে যে, তুধলির হাতে লেখা ইনভিটেশন কার্ড ওর কাছে আছে।

বাজে কথা, নন্দন মিথ্যেবাদী।

কিন্তু কেউ তো করেছে।

সোমলতা ঝংকার দিয়ে উঠে বলে, তারই বা কী মানে আছে? আমার তো মনে হয় কেউই ওকে নেমন্তন্ন করে নি। ও নিজেই এসেছে।

কেন আসবে?

তোমাকে আর আমাকে এমবারাস করার জন্য।

নন্দন কি এত সামান্য প্রতিশোধ নিতে আসবে? ও তো কথা দিয়েছিল কোনোদিন আসবে না আমাদের কাছে।

ওর কথার কোনো দাম নেই।

সোমা, নন্দনের বয়স কত হলো বলো তো!

পঞ্চাশের কাছাকাছি। লেট ফর্টিজ।

ওকে আরও দশ বছর কম দেখায়। ভুটিয়া বলছিল লোকটার বয়স ত্রিশ পঁয়ত্রিশ।

নন্দনের বয়স নিয়েও কি তোমার টেনশন হচ্ছে?

না বরং সেটাই একমাত্র রিলিফ।

তার মানে?

নন্দনের বয়স যদি এখন পঁয়ত্রিশ,বলে লোকে ভাবে তাহলে সেই ক্যালকুলেশনে তুধলি জন্মানোর সময় ও নাবালক ছিল। অন্তত লোকে তাই ভাববে।

সোমলতা ফোঁস করে উঠল, তোমার মনের মধ্যে এত কমপ্লেক্স কেন বলো তো!

কমপ্লেক্স নয়, টেনশন। নন্দন ভুটিয়াকে তেমন কিছু বলে নি তো!

না, তবে একটা কথা মনে রেখো। নন্দনকে ভুটিয়া না চিনলেও দেশের পাঁচজন চেনে। হি ইজ এ ফেমাস ম্যান।

হ্যাঁ, কিন্তু ক্লোজ সার্কেলে। নন্দনকে চেনে শুধু হাইলি প্লেসড পিপল, পাবলিক নয়।

তাতে কিছু যায় আসে না। নন্দনের বয়স কত তা অনেকেই জানে।

তুমি আমার টেনশন বাড়িয়ে দিচ্ছো।

মোটেই নয়। নন্দনের দিক থেকে বিপদের সম্ভাবনা যদি থাকে তবে তার ডিসেপটিভ চেহারাটাই শুধু আমাদের বাঁচাবে না।

তাহলে কী বাঁচাবে?

সাহস, একটু সাহসী হও।

তুমি জানো, কোনো কথা উঠলে আমার মেয়ের ভবিষ্যৎ কী হবে?

তোমাকে একটা কথা বলব?

বলো।

নন্দনের জন্য দায়ী কে?

আমি, একমাত্র আমিই। কিন্তু সে কথা তুলে লাভ কী?

আমি তোমার বউ। আমি তোমাকে আজ কাঠগড়ায় দাঁড় করাব না। এমন কথাও বলবো না যে দায়টা সবটাই তোমার। তোমার দোষ যদি পঁচাত্তর ভাগ তো আমারও পঁচিশ।

না সোমলতা, একশ ভাগই আমার।

যদি তাই হয়ে থাকে তবু তোমার আজ এত ভয় পাওয়ার কিছু হয় নি। নন্দন তোমার মেয়ের জন্য একটা প্রেজেন্টেশন এনেছিল। খুবদামী একটা জড়োয়া সেট।

তোমার হাতে দিয়ে গেছে, না ভুধলির হাতে?

আমার হাতে।

ভুধলিকে দেখতে চায় নি?

না। ভুধলিকে ও প্রায়ই দেখেছে।

কোথায়?

কলেজে, রাস্তায় ঘাটে।

ফলো করত নাকি?

অসম্ভব নয়। তবে আমি জানতে চাই নি। হি হ্যাজ হিজ রাইটস।

মানছি সোমলতা, মানছি। হি হ্যাজ হিজ হিউম্যান রাইটস। বাট নট লিগ্যাল রাইটস।

ওকথা ওঠে কেন? নন্দন তো এই একটি দিন ছাড়া আর কখনও আমাদের কাছাকাছি আসবার চেষ্টা করে নি।

তা বটে, কিন্তু এসেই যে সিন ক্রিয়েট করলো। সকলের নজরে পড়ে গেল। ইচ্ছে করে নয় তো!

তা আমি জানি না। তবে আমাকে বলল, কিছুদিন হলো ওর শরীর খারাপ যাচ্ছে।

ম্যাসিভ হার্ট ট্রাবল? ক্যানসার? লিউকোমিয়া?

তুমি কি ওর ওরকমই কিছু চাও?

মানুষ হিসেবে নিশ্চয়ই চাই না। কিন্তু অ্যাজ এ জেলাস হ্যাণ্ড পজেটিভ ফাদার, আজ এ পিস-লাভিং সিটিজেন, চাই। নন্দন যদি একটু তাড়াতাড়ি মরে তাহলে হোয়াট এ রিলিফ!

চিরকালের মতো বেঁচে যাবে তাহ'লে?

কি জানি সোমা, কেঁচো খুঁড়তে কবে সাপ বেরিয়ে আসে, ভীষণ টেনশন, গত বিশ বছর ধরে টেনশন।

সোমলতা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, এখন বাথরুম থেকে চোখে মুখে জল দিয়ে এসো তো। একটা কামপোজ খাও। ঘুমোনোর চেষ্টা করো।

ঘুম হবে না। কিছুতেই হবে না। আমাকে জানতেই হবে নন্দন কেন এসেছিল। কেন সিন ক্রিয়েট করল।

সোমলতা স্বামীর দিকে ফিরে শুয়ে বললেন, আমি মনে করি, নন্দন একবার কনের সাজে তুধলিকে দেখতেই এসেছিল। ও তো আর্টিস্ট, জানোই। আজ তুধলিকে দেখার একটা আলাদা দাম আছে।

তুমি জানো না সোমলতা, হি ইজ এ ট্রেইটর, হি ইজ এ ডাউনরাইট ব্ল্যাকমেইলার।

কেন বলো তো! ও কী করেছে?

প্রিয়নাথ কিছুক্ষণ কথা বলে না। তারপর বলে, যাক সেসব কথা।

বলবে না ?

শুনলে তুমিও টেনশনে ভুগবে।

নন্দন তোমাকে ব্ল্যাকমেল করে ? প্লীজ লুকিও না। পুরুষমানুষেরা বউয়ের কাছে কথা লুকোয় বলেই সংসারে এত অশান্তি। এতদিন কেন বলো নি।

বউয়েরাও লুকোয়।

সোমলতা উঠে বসে। প্রিয়নাথকে ও হাত ধরে টেনে বসানোর চেষ্টা করে।

টানছো কেন বলো তো!

উঠে বোসো। এসব ইম্পর্টান্ট কথা, শুয়ে হয় না।

প্রিয়নাথ তার স্ত্রীর অনুগত। উঠে বসে। তারপর বলে, আগে করতো না, কিন্তু ইদানীং নন্দন আমাকে ব্ল্যাকমেল করে।

সেটা কি রকম ?

ওর অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। অথচ হি ইজ এ কালেকটার। কালেকটারদের স্বভাব হলো ড্রাগের নেশারুদের মতো। ঘটি বাটি বন্ধক দিয়েও শখের জিনিস কিনবেই। নন্দন গত কয়েক বছর ধরে আমার কাছ থেকে এসব কালেকশনের টাকা আদায় করছে। গত বছর ওকে দিল্লির এক এগজিবিশন থেকে হুশেনের একটা ছবি কিনে দিয়েছি। ছ মাস আগে একটা গ্র্যাণ্ড পিয়ানো কিনলো। একটু পুরোনো বন্দুক। সব দাম আমাকে মেটাতে হয়েছে।

না মেটালে নন্দন সান্যাল কথা ফাঁস করে দেওয়ার ভয় দেখিয়েছিল কি ?

না।

তাহলে ?

শুধু বলেছে, তোমার তো এখন বেশ টাকা হয়েছে, আমাকে ওটা কিনে দাও, সেটা কিনে দাও।

কোনোরকম থ্রেট করে নি ?

না। হি ইজ নট এ ফুল। ও জানে থ্রেট করার কিছুই নেই। থ্রেট না করলেও থ্রেটটা তো আণ্ডার লায়িং থেকেই যাচ্ছে।

ব্ল্যাকমেল তো নাও হতে পারে।

তুমি নন্দনকে চেনো না। ও জানে ব্ল্যাকমেল করার জন্য আমার মতো দুর্বল মানুষকে হুমকি দেওয়ার প্রয়োজন নেই। শুধু এসে দাঁড়ালেই কাজ হাসিল হয়ে যাবে।

সোমলতা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে, এটা অনেক আগেই তুমি আমাকে বলতে পারতে।

বলে লাভ কি ? তোমারও টেনশন বাড়ত, আমার একার ওপর দিয়ে যা গেছে গেছে।

নন্দন তো কই আমাকে কখনও ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করে নি !

তুমি তো আমার মতো দুর্বল নও। নন্দন জানে তোমার কাছে সুবিধে হবে না।

সোমলতা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তুমি দুর্বল তা জানি। কিন্তু সেটা এমনিতে হয় নি। ভেতরে ভেতরে অনেকদিন ধরেই তোমার একটা ক্ষয় চলছে। কেন যে আমাকে বলো নি। বললে আমি তোমাকে পরামর্শ দিতে পারতাম। নন্দনকে গিয়ে শাসন করতে পারতাম।

শাসন! বলে প্রিয়নাথ চুপ করে রইল। অনেকক্ষণ বাদে বলল, তুমি হয়তো পারো। তোমার সাহস আছে। আমি কেন যেন ভয় পেতাম।

ভয় পাওয়ার কারণ আছে বলেই পেতে। কিন্তু ভয়ের ভাগটা তো আমিও নিতে পারতুম কিছুটা। তাতে ভালো হতো। ও এ পর্যন্ত তোমার কাছ থেকে কত আদায় করেছে ?

খুব বেশী নয়, আর বেশী দিন ধরেও নয়। নন্দনের অবস্থা যখন ভালো ছিল তখন ও পয়সাকে পয়সা বলেই মনে করত না। তবে গত কয়েক বছর ধরে ওর লীন পিরিয়ড চলছে।

কত দিয়েছো তার হিসেব নেই ?

লাখ খানেকের কাছাকাছি।

সে তো অনেক টাকা !

একবারে তো নেয় নি, আর ক্যাশও নেয়নি। শুধু পুরনো জিনিস কিনে দিতে অনুরোধ করেছে। আমিও দিয়েছি। ও অনেকবার বলেছে, যে সব জিনিস ওর কালেকশনে আছে তার বেশীর ভাগই ও ভুধলিকে দিয়ে যাবে।

সর্বনাশ !

সর্বনাশ কেন ?

ভুধলি এক্সপ্ল্যানেশন চাইবে না ?

ওহোঃ ! তাই তো ! এটা আমার মাথায় আসে নি।

তোমার মাথা ভালো কাজ করছে না। মাঝে মাঝে অন্যের বুদ্ধি নেওয়া ভালো। ভুধলি জানতে পারলে হয়তো সুইসাইড করবে।

প্রিয়নাথ চিন্তিত ভাবে বলল, আমি কালই নন্দনের সঙ্গে দেখা করব।

কী বলবে ?

বলব যে, ভুধলিকে ও যেন কিছু না দেয়।

তুমি বোকা।

কেন বলো তো।

ভুধলিকে নয় না-ই দিলো, আমরা তো আছি। শুনেছি ওর কালেকশনের দাম লক্ষ লক্ষ টাকা।

হ্যাঁ। নন্দন কিছুদিন আগে একটা নস্যির ডিবে বিক্রি করলো পাঁচ হাজার টাকায়। একটা নস্যির ডিবেরই যদি এতো দাম হয় তাহলে—

তাই তো বলছি, তুমি ওকে বলবে যে, ভুধলিকে যদি ও কিছু দিতেই চায় তাহলে যেন আমাদের মারফৎ দেয়।

ওর অন্য কোনোও মতলব নেই তো সোমলতা ?

সেটা আমি কী করে বলবো ? বহুকাল ওর সঙ্গে দেখা নেই, বোধহয় দশ

বছর বাদে এই দেখা হলো।

তোমাকে নন্দন আর কী বললো?

প্রথমটায় অনেকক্ষণ চেয়ে রইল।

প্রেমিকের মতো?

এত দিন কি কিছু থাকে? প্রেম যে আমাদের মধ্যে ছিল না তা তো তুমিও জানো।

প্রিয়নাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, নন্দনের পক্ষে প্রেম হওয়া শক্ত। সারা জীবন কতো মেয়েমানুষ যে ঘাঁটল। অত মেয়েমানুষের সঙ্গে যারা নষ্টামি করে তাদের কি প্রেম বলে কিছু থাকে। তারপর বলো।

আমাকে দেখে একটু ভয়ও পেয়ে থাকবে হয়তো।

না, না, ভয় খাওয়ার মালই নয়।

ভয় না হলেও হয়তো অস্বস্তি।

তারপর?

আমি পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক জিজ্ঞেস করলাম, কেন এসেছো?

ভুটিয়া সামনে ছিল তখন?

না, আমি ওকে সরিয়ে দিয়েছিলাম।

তারপর কী হলো?

একটাও কথা না বলে পকেট থেকে নীল কাগজে মোড়া একটা নেকলেস বের করে আমার হাতে দিয়ে বলল, তুধলিকে দিও। এটা দিতেই আসা।

তুমি নিলে?

নেবো না কেন? তুধলিকে তো ও দিতেই পারে। ওর অধিকার সবচেয়ে বেশীই তো!

বোলো না। শুনতে আমার খারাপ লাগছে। তুধলি আমার মেয়ে, এ-কথা-টাই আমাকে ভাবতে দাও।

সেটাও সত্যি। তোমার মেয়ে ছাড়া আর কার? অষ্টেপৃষ্ঠে তোমারই। আমি শুধু নন্দনের অধিকারটুকুর কথা বললাম।

তুধলিকে নেকলেসটা দিয়েছিলে ?

দিলাম। নন্দন তো কোনো কেস আনে নি। মনে হয় কেউ পুরনো জিনিস বেচে দিয়েছিল। আমি তুধলির একটা নেকলেসের বাক্সে ভরে ওকে দিয়েছি।

কোনো প্রশ্ন করে নি তুধলি ?

না। এত গয়না পেয়েছে, কোন্টা কে দিলো তা নিয়ে মাথা ঘামাবে কখন ? তবে অনেকগুলো হীরে আর চুণী বসানো নেকলেসটা খুব মুগ্ধ হয়ে দেখছিল। হয়তো প্রশ্ন করতো, তার আগেই আমি সরে এসেছি।

খুব দামী, না ?

ভীষণ। আমার তো মনে হয় ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকা অনায়াসে হবে।

ও বাবা ! দামী হলে কিন্তু সোর্স নিয়ে প্রশ্ন উঠবে সোমা।

অতো ভেবো না। টেনশনের ওপর টেনশন তৈরি করলে সত্যিই তোমার স্ট্রোক হয়ে যেতে পারে। এসো, ঘুমোও।

ঘুম ! অসম্ভব। ক'টা বাজে এখন বলো তো ?

তিনটে, সোয়া তিনটে হবে।

ঘুম আর হবে·না। বাইরে গিয়ে একটু পায়চারি করি। ঘরে বড্ড গুমোট!

তার চেয়েও ভালো একটু শরীরের ভালবাসা। এসো, একটু টায়ার্ড হও, ঘুম এসে যাবে।

সেক্স? অসম্ভব। তুমি কি জানো না সোমলতা সেক্স অনেকটাই মনের ওপর নির্ভরশীল ? টেনশন থাকলে ওটা হয় না।

জানি, সবই জানি। পুরনো কথা তোমাকে যেমন কুরে খায়, আমাকেও তেমনি খায়। তবে তোমার মতো আমি ব্রুড করি না। জীবনে অনেক কিছুই ঘটে যায়, সব কিছুর ওপর তো আমার হাত নেই। আমি মনে করি ওসব জলের দাগ। একদিন মুছে যাবে।

আমরাই তো মুছে যাবো। সব বুঝি, তবু যখন ঘটনা ঘটে তখন আমি সবচেয়ে বেশি টালমাটাল হয়ে যাই। আমার স্বভাবই ওরকম।

আচ্ছা, তোমাকে একটা প্রশ্ন করবো ?

করো।

সত্যি জবাব দেবে ?

তোমার কাছে অন্যরকম কিছু বলে লাভ কি ?

সেই ঘটনার পর থেকে আমার প্রতি তোমার কোনোও চাপা ঘেন্না নেই তো ?

কোনোদিন দেখেছো ?

ওপর থেকে তো বোঝা যায় না।

পঁচিশ বছর ঘর করার পর এ কী প্রশ্ন সোমলতা ? ছিঃ।

শত হলেও অন্তত একবার অন্য পুরুষ—

সে তো আমার ইচ্ছেয় এবং নির্দেশে—

তা হোক, সেটা তো পৌরুষের পক্ষে—

বোলো না। আমাদের অনেক বয়স হয়েছে সোমলতা। এখন ওসব পাপ-বোধ নিয়ে কষ্ট পাওয়ার মানে হয় না।

বাইরে উত্তেজিত কথাবার্তা শোনা গেল হঠাৎ। সবার ওপরে ভুটিয়ার গলা।

প্রিয়নাথ উৎকর্ণ হয়ে শুনে বলল, কারা বলো তো ?

বিয়ে বাড়িতে কত গোলমাল হয়। বাইরে গিয়ে দেখ না। ভুটিয়ার গলা বলে মনে হচ্ছে।

প্রিয়নাথ একটু শুনে বলল, ভুটিয়াই। দেখতে হচ্ছে—

প্রিয়নাথ ওঠবার আগেই দরজায় ধাক্কা পড়ল। ভুটিয়ার গলা শোনা গেল, দিদি ! জামাইবাবু।

প্রিয়নাথ উঠতে উঠতেই বলল, এই রে! আমার বুক যে ভীষণ কাঁপছে।

এত নার্ভাস কেন তুমি ?

নার্ভাস বলেই নার্ভাস। এত রাতে ডাকছে কেন ?

তুমি বোসো। আমি দেখছি।

সোমলতা উঠে দরজা খুলল। সামনে ভুটিয়া। উদ্‌ভ্রান্ত মুখ।

কী রে ?

ইয়ে, তুধলিটা যে কোথায় গেল ?

তার মানে ?

মানে, অগ্নিভ বলছিল, তুধলি নাকি বেশ কিছুক্ষণ আগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। এখনও ফেরে নি।

বাথরুমে গেছে বোধহয়।

দেখেছি নেই। ভাবলাম তোর ঘরে এসেছে কিনা।

সব জায়গা দেখেছিস ?

হ্যাঁ, ছাদ অবধি নেই।

হঠাৎ বেরিয়ে কোথায় যাবে ? বাথরুম ছাড়া !

সেইটেই তো বুঝতে পারছি না। ঘণ্টা দেড়েক হয়ে গেল।

দেড় ঘণ্টা ! চল তো, আমি দেখি।

প্রিয়নাথ বুকে হাত চেপে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর এই অবস্থা সহ্য করতে না পেরে উঠে এলো।

বারান্দায় অগ্নিভ দাঁড়ানো। পৌরুষব্যঞ্জক চেহারা। বেশ লম্বা এবং মেদ-হীন চমৎকার স্বাস্থ্য। তুধলির চেয়ে বয়সে অন্তত বছর দশেকের বড়। মানাবে কি না সংশয় ছিল সোমলতার। কিন্তু প্রিয়নাথের সংশয় ছিল না। পৌরুষ ! পৌরুষের প্রতি তার বড় মোহ।

প্রিয়নাথ ভারী ভীরু পায়ে এগিয়ে গেল।

অগ্নিভ।

বলুন।

কী হয়েছিল অগ্নিভ ?

অগ্নিভ একটু হাসল। নিরুদ্বেগ হাসি। বলল, তুধলি ঘরে নেই, এই মাত্র। হৈ-চৈ করার মতো ব্যাপার নয়। আমি একটু বাইরে গিয়েছিলাম সেই সময়ে কারা এখানে এসে যেন ওর খোঁজ করে। তারপর থেকে খোঁজাখুঁজি

চলছে।

আমি সে কথা বলছি না।

তাহলে ?

তোমার সঙ্গে কিছু হয় নি তো ! আমার মেয়ের মাথায় ছিট আছে।

তুধলি তো বেশ বুদ্ধিমতী। ছিট থাকবে কেন ?

বড্ড আদুরে যে। আদুরেদের মেজাজটাও তো লজিক মেনে চলে না। তুমি জানো না, তুধলি এখনও আমার কোলে উঠে বসে থাকে। কত দিন আমি ভাত মেখে খাইয়ে দিয়েছি। তাই ভাবছিলাম, তোমার সঙ্গে ঝগড়া করে নি তো ?

না। ঝগড়া নয়। তবে মতপার্থক্য হচ্ছিল একটু। কিন্তু তাও এত সামান্য যে রিঅ্যাকশন হওয়ার কথাই নয়।

আমার বড্ড ভয় করছে।

ঘাবড়াবেন না। আমি হলে ব্যাপারটা একদম চেপে যেতাম। কিন্তু ওই অজয়, ভুটিয়া ওরা মিলে খামোখা একটা সিন ক্রিয়েট করলো। আমার মনে হয় ও লুকিয়ে আছে কোথাও।

তুমি ওর ওপর রাগ করো নি তো অগ্নিভ ?

না না, রাগ করার মতো কিছুই হয় নি। আর আমি কিন্তু তত রাগীও নই ! আমি একটু অপ্রতিভ বোধ করছি। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনি কি জানেন, ওর কোনো লাভ অ্যাফেয়ার ছিল কি না।

প্রিয়নাথ এ কথায় চোখ কপালে তুলে বলল, লাভ অ্যাফেয়ার ! না না, ওসব আমার মেয়ের ধাতেই নেই। তোমার এ কথা মনে হলো কেন ?

ভাবছি আমার সঙ্গে ভালো করে পরিচয় হওয়ার আগেই ও এরকম ব্যবহার করছে কেন। আমি লোকটা ভালো না খারাপ তা বুঝবার মতো সময়ও তো নেয়নি আপনার মেয়ে।

প্রিয়নাথ অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে মাথা নেড়ে বলল, লাভ অ্যাফেয়ার থাকতেই পারে না। থাকলে ও কখনও এ বিয়েতে রাজি হয় ? আজকালকার মেয়ে

তো আর পুঁটুলির মতো বস্তু নয়। একটু পাগলী, এই যা।

অগ্নিভ অসহায় মুখ করে বলল, দেখুন এটা মেয়েদেরই আপার হ্যাণ্ড নেওয়ার যুগ। কিছু হলে সবাই আমাকেই দায়ী করবে। অথচ তুধলির সঙ্গে আমার ভালো করে পরিচয়ই হয় নি। লুকিয়ে যদি থাকে তবে ভালই। কিন্তু যদি পালিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে—

লুকিয়ে আছে! লুকিয়ে আছে! দাঁড়াও, আমি ডাকলেই বেরিয়ে আসবে। কোনোদিন তো আমার অবাধ্য হয় নি।

বলতে বলতে উত্তেজিত প্রিয়নাথ, কোন্‌দিকে যাচ্ছে তা খেয়াল না করে, অতি দ্রুত পায়ে একদিকে রওনা হলো।

তুধলি! তুধলি-ই!

৫

ভোর রাতে টেলিফোন বাজল।

সারা রাত ঘুমোয় নি বললেই চলে। শরীরটা অনেকদিন আগেই তার হাতের বাইরে চলে গেছে। যৌবনে একবার টি বি হয়েছিল। প্রচুর ব্যয়-সাপেক্ষ চিকিৎসার পর ভালো হয়ে ওঠে। ডাক্তার তখনই মদ আর সিগারেট বারুণ করে দিয়েছিল। নন্দন করে নি। রাত জেগে ছবি আঁকা, গান গাওয়া, জলশা শোনা, বই পড়া, ফুর্তি করা তার বহুদিনকার অভ্যাস। নন্দন কখনও ব্যায়াম করে নি, শরীরের যত্ন নেয় নি, খাদ্যাখাদ্য বিচার করে নি।

আজ তো শরীর শোধ নেবেই। আজ শরীরই নন্দনের সবচেয়ে বড় শত্রু। যখন শরীরকে টের পায় লোকে তখনই বুঝতে হবে শরীর বিগড়েছে। যার শরীর ভালো সে শরীরকে টের পায় না।

ঝুধলির বিয়েতে গিয়ে যখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল তখন তার কিছু করার ছিল না। আজকাল এই অজ্ঞান হওয়াটা মাঝে মাঝে ঘটছে। মাথায় রক্ত চলাচলে শর্ট সার্কিট, লো প্রেশার, সেই সঙ্গে এপিলেপসিও দেখা দিচ্ছে না তো!

হতে পারে অনেক কিছু হতে পারে। তবে নন্দন ধরেই নিয়েছে, তার আয়ু বেশীদিন নেই। নন্দনের এখন মরে যেতে তেমন কোনো আপত্তিও হবে না। কেন না তার আর কিছু করার নেই, হওয়ার নেই, পাওয়ার নেই। মন এখন কামনা ও বাসনাশূন্য। সেটা বৈরাগ্য নয়, নিথরতা।

নন্দনের বাড়িটা বিশাল। সামনে প্রায় পাঁচ কাঠা একটা লন ছিল। ছ

বছর আগে এক গুজরাটির কাছে বেচে দিলো নন্দন। এখন সেখানে পাঁচ তলা একটা অ্যাপার্টমেন্ট হাউস। বাড়িটার জন্যও লোভনীয় সব প্রস্তাব আসে। ওপর নিচ মিলিয়ে বারো তেরো খানা ঘর। সে আমলের খাঁটি মার্বেল, পঙ্খ আর বার্মা সেগুনের কাজ আছে বাড়িটাতে। দামী আসবাব। আর আছে কয়েক লক্ষ টাকার কালেকশন। বাড়িটা ইচ্ছে থাকলেও, বেচতে পারে না নন্দন। এক মাড়োয়ারি ঘোরাঘুরি করছে। বারো লাখ টাকা দিতে চায়। নন্দন যতদিন বাঁচবে সে বাড়িতে হাত দেবে না। নন্দন মরার পর দখল নেবে। যাকে যে জিনিস দেওয়ার ইচ্ছে নন্দনের ঠিক তেমনি বিলি বন্দোবস্তও মাড়োয়ারি করে দেবে। এখনও রাজি হয় নি নন্দন। তবে ভাবছে।

বারো লাখ, অনেক টাকা। সে তো খরচ করে শেষ করতে পারবে না। কাকে দেবে?

একমাত্র ভুধলি। তার সবচেয়ে নিকট আত্মীয়। অথচ দেওয়াও যায় না। দিলেই প্রশ্ন উঠবে, কেন দিলো, কী ব্যাপার, কিসের সম্পর্ক? আর যাই হোক, মেয়েটার জীবনে সন্দেহের ছায়াপাত ঘটাতে পারে না তো নন্দন।

প্রিয়নাথ তখন কতো অন্যরকম ছিল। সংস্কারমুক্ত, সাহসী, ঝকঝকে লজিক্যাল ছেলে। সোমলতাও অনেকটা তেমনি। প্রিয়নাথের সঙ্গে প্রগাঢ়-তম বন্ধুত্ব ছিল নন্দনের। প্রিয়নাথের বিয়ের পর কিছুদিন বাসার অভাবে ছিল নন্দনের বাড়িতে। নন্দন বিয়ে করে নি, প্রকাণ্ড বাড়ি আত্মীয়হীন ফাঁকা। নিচের তলায় ওরা থাকতো।

বিয়ের তিন বছর বাদে প্রিয়নাথ একদিন গোপনে যা বলল তার অর্থ হলো, তাদের ছেলেপুলে হওয়ার কোনোও সম্ভাবনা নেই। প্রিয়নাথের শরীরে শুক্রাণুর অভাব।

সমস্যাটা এমন কিছু নয়। অনেকেরই হয় না! কিন্তু প্রিয়নাথ পরিষ্কার বলল, আমার বাচ্চা চাই।

এই নিয়ে অনেক আকচা-আকচি, কান্নাকাটি, অ-বনিবনা।

তারপর প্রিয়নাথই একদিন এল নন্দনের কাছে, আমি না পারি তুই পারবি। তোকে পারতে হবে। 'বাবা' ডাক না শুনলে আমি মরে যাবো।

নন্দন বরাবর সংস্কারমুক্ত। এসব ব্যাপারে তার পাপবোধও নেই। অনুরোধ উপরোধে সে রাজি হলো। রাজি হলো সোমলতাও।

তারই ফল তুধলি।

তুধলি হওয়ার অনেক আগেই নন্দনের বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে তারা। পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত করে দিয়ে। নন্দন কথা দিয়েছিল, কোনো-দিন ওদের ছায়া মাড়াবে না।

কিন্তু শেষ অবধি পারে নি। তুধলির বিয়েতে সে ভূতগ্রস্তের মতো গিয়ে হাজির হয়েছিল। ইচ্ছে ছিল, কেউ কিছু টের পাওয়ার আগেই সোম-লতার হাতে গয়নাটা দিয়ে চলে আসবে। সব ভণ্ডুল হয়ে গেল। তবু ততটা ক্ষতি হয়তো হয় নি। সোমলতা বুদ্ধিমতি। সামলে নেবে।

তুধলি এখন নন্দনের জীবনে সবচেয়ে ভাবনার বস্তু। সে জানে, তুধলি তার মেয়ে, কিন্তু তুধলি তা জানে না। এই যে নন্দন একতরফা জানে, এর একটা যন্ত্রণা আছে। এই যন্ত্রণাও অলক্ষ্যে কুরে কুরে বহুদিন ধরে খেয়েছে নন্দনকে। আবডাল থেকে তুধলির বড় হওয়া লক্ষ্য করেছে নন্দন। কোটি কোটি মানুষের মধ্যে ওই একটি মানুষ তার আপনার জন, এ কথা কেন যে ভুলতে পারল না সে!

আজকাল মাঝে মাঝে ঘুম আসতে চায় না। বিশাল বাড়ি আর তার মধ্যে হাজারো জিনিস যেন তার দম চেপে ধরে।

একবার তুধলির এক ছেলে-বন্ধু তার দিকে ফিরে চেয়ে রুখে এসেছিল। আপনি আমাদের ফলো করছেন কেন বলুন তো!

নন্দন এত ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে বলার নয়। বলেছিল, না না, শুধু হাঁটছি।

না ফলো করছেন। আমরা ইচ্ছে করে অনেকগুলো মোড় নিয়েছি। আপনি পিছু ছাড়েন নি।

কোনোরকমে পালিয়ে বেঁচেছিল নন্দন।

বেনামে কিছু জিনিস পাঠিয়েছিল সে তুধলিকে। তুধলি হয়তো অবাক হয়েছে কিন্তু নিয়েছে। নিজের নাম ঠিকানা সরাসরি দেয় নি নন্দন। চেনা পোস্টমাস্টারের কেয়ার অফ দিয়েছিল। জানত, তুধলি খোঁজ নেবে। পোস্টমাস্টার অবশ্য খোঁজ দেয় নি। বাঁচোয়া।

এসব কেন করেছিল নন্দন?

দীর্ঘদিন ধরে সে জবাবটা খুঁজেছে। এই তুর্বার তুর্বলতার কোনো চিকিৎসা সে খুঁজে পায় নি।

টেলিফোনটা তুলে কানে দিতেই ওপাশ থেকে প্রিয়নাথের উত্তেজিত গলা পাওয়া গেল, তুমি—তুমিই কিডন্যাপ করেছো তুধলিকে, নন্দন! তোমাকে আমি খুন করব, পুলিশে দেবো, তুমি ভেবেছোটা কী? আমাদের জীবন নষ্ট করে, তুধলির জীবন নষ্ট করে পার পেয়ে যাবে?

নন্দন এত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল যে জবাবই দিতে পারল না। প্রিয়নাথ এক নাগাড়ে তাকে শাসাচ্ছে।

ক্লান্ত গলায় বলল, প্রিয়নাথ, কী হয়েছে একটু গুছিয়ে বলবে?

কী হয়েছে? কী হয়েছে তুমি তা জানো না, ন্যাকা কোথাকার?

নন্দন উঠে বলল, শোনো প্রিয়নাথ, আমার শরীর ভালো নয়। কোনো অ্যাডভেনচার করার পক্ষে তো নয়ই। তুধলিকে কিডন্যাপ আমি করি নি। কিন্তু কি হয়েছে খুলে বলো। ওকে কি পাওয়া যাচ্ছে না?

না পাওয়া যাচ্ছে না। শী হ্যাজ ভ্যানিশড। কমপ্লিটলি। এর জবাবদিহি তোমাকে করতে হবে, তোমাকে।

আমার জবাবদিহি করার কথা নয়। তুমি পুলিশে খবর দাও।

দিয়ে কী হবে? বেয়াই বাড়িতে, সমাজে আর মুখ দেখাতে পারব? জামাই আমাকে আর ভদ্রলোক বলে মনে করবে?

তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

এ কেস তোমার বেলায় হলে মাথা তোমারও খারাপ হতো।

কেসটাই তো এখনও বলো নি।

আমি তোমার বাড়িতে চড়াও হবো নন্দন। যদি ভালো চাও তো তুধলিকে ছেড়ে দাও। আধ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি।

তার জন্য ধন্যবাদ। তুমি আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করো না। এখনই চলে এসো, বাড়ি সার্চ করে যাও।

তাহলে তুমি ওকে অন্য কোথাও লুকিয়ে রেখেছো।

প্রিয়নাথ, তুধলি তত ছোটো নয় যাকে বিনা বাধায় ভুলিয়ে ভালিয়ে চুরি করা যায়। বিশেষত বিয়েবাড়ি থেকে।

তুমি ! তুমি ! তুমি ছাড়া কেউ নয়।

কখন থেকে ওকে পাওয়া যাচ্ছে না ?

রাত তুটো আড়াইটা থেকে। আমার মনে হয় তুমি বাইরে কোথাও ওর সঙ্গে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করেছিলে। তারপর মুখে কাপড় গুঁজে তুলে নিয়ে গেছ।

আজকাল খুব থ্রিলার পড়ছ প্রিয়নাথ। কিন্তু তুধলিকে তুলে আনার পেছনে আমার স্বার্থ কী ? মোটিভ কী ? লাভ কী ?

ব্ল্যাকমেল করবে, আবার কী ? গত দশ বছর ধরে তুমি তো তাই করছ !

প্রিয়নাথ, আমি তোমার কাছে যা নিয়েছি তা ধার হিসেবে। পাই পয়সা অবধি শোধ হয়ে যাবে। তুমি লোভী, যা দিয়েছো তার অনেক বেশীই পাবে। ওটা ব্ল্যাকমেল নয়।

তোমাকে আমি খুব চিনি নন্দন। ধার আমাকে দেখিও না।

সে তুমি যা ইচ্ছে ভাবতে পারো, আমার কিছু করার নেই। তবে এটা জেনো, তুধলির প্রেস্টিজ আমারও প্রেস্টিজ। আমি এমন কিছু করার কথা ভাবতেও পারি না যাতে তুধলির ক্ষতি হয়।

তুমি সব পারো। ইউ আর এ ভিলেন।

আমি যদি উল্টোটাই বলি প্রিয়নাথ ? যদি বলি যে, নাটের গুরু তুমিই ?

আমি ?

ঢুধলির জন্ম কার প্ররোচনায় হয়েছিল প্রিয়নাথ? কার মন রাখতে আমাকে আর সোমলতাকে এতকাল মিথ্যাচার করে যেতে হলো?

তার জন্য অশেষ ধন্যবাদ তোমাকে। কিন্তু এই একবার দয়া করো নন্দন। ঢুধলিকে আমি কিডন্যাপ করি নি। বিশ্বাস করো। কিন্তু অন্য কেউ করে থাকলে সেটা আমার কাছে তেমনই ভয়াবহ, যেমনটি তোমার কাছে!

প্রিয়নাথের ফোঁপানির শব্দ টেলিফোনটাকে ভারাক্রান্ত করে তুলছিল।

এ সর্বনাশ আমার কেন করলে নন্দন? কেন করলে?

তোমার একজন স্কেপগোট দরকার বলেই কি দায়টা আমার ঘাড়ে ফেলতে চাইছো প্রিয়নাথ?

তাহলে ঢুধলি কোথায় গেল?

কোথায় যেতে পারে তা ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখ।

মাথা ঠাণ্ডা রাখা অসম্ভব। অগ্নিভ সন্দেহ করছে যে ওর পুরোনো লাভ অ্যাফেয়ার ছিল।

বাজে কথা।

বাজে কথা? ঠিক তো!

খুব ঠিক। ঢুধলির সব অ্যাকটিভিটির খবর আমি রাখি।

ধন্যবাদ। তাহলে কী হতে পারে?

ভাবতে দাও প্রিয়নাথ। ছেড়ে দিও না, আমার ব্রেন এখন আর আগের মতো কাজ করে না।

ভাববে? ভাববার কি সময় আছে?

বিয়েবাড়ির কাছাকাছি ঢুধলির কোন্ কোন্ বন্ধু থাকে খোঁজ নাও।

কেউ কিছু বলতে পারছে না। এত রাতে বন্ধুদের বাড়ি হানা দিলে কি রকম রি-অ্যাকশন হবে সেটা আন্দাজ করতে পারছো? স্ক্যাণ্ডেলের আর কিছু বাকি থাকবে না।

তা বটে। শোনো, তুমি এমনিতেই ভীষণ নার্ভাস টাইপ, খুব উত্তেজিত হয়েছো। মাথা ঠাণ্ডা না রাখলে তুমিই ব্যাপারটা ঘুলিয়ে তুলবে। ঠাণ্ডা

হও প্রিয়নাথ। আমাকে সন্দেহ কোরো না। ভুধলির কোনোও ক্ষতি আমি করতে পারি না। কারণ পৃথিবীতে আমার একমাত্র আত্মীয় এখন সে-ই।

না! বলে এক বিকট আর্তনাদ ছাড়ল প্রিয়নাথ, না! না! না!

ফোনটা কান থেকে সরিয়ে নিল নন্দন। নইলে কানের পর্দা বুঝি ফেটেই যেত। প্রিয়নাথের এই বিস্ফোরণে আপনমনে একটু হাসল নন্দন। তারপর ফোনটা আবার কানে লাগিয়ে বলল, আরে অত হেস্টি হয়ো না। জন্মদাতার ভূমিকা খুবই নগণ্য, পালনকর্তার ভূমিকা অনেক বড়। আমি জনক মাত্র, তুমি পিতা। ভুধলির ওপর তোমার দাবি অনেক বেশি।

চুপ করো! আমি ওসব শুনতে চাই না।

শুধু একটা কথা প্রিয়নাথ, তুমি তো জানো, আমার কেউ নেই।

প্রিয়নাথ সশব্দে টেলিফোন রেখে দিলো।

নন্দন চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ। শরীর, শরীরময় এই অস্তিত্ব, এই বেঁচে থাকা, তুচ্ছ দুর্বল শরীরটা বশ মানছে না নন্দনের। তার মাথা অন্ধকার লাগছে। সর্বাঙ্গে মৃদু একটা শক লাগার মতো কাঁপুনি।

তবু নন্দন উঠতে গেল। চোখ অন্ধকার লাগল। ঝিম্ করে সেতার বেজে উঠল তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে।

অজ্ঞান হয়ে যাবে?

না, ধীরে ধীরে শরীরের বিকার সরে যেতে লাগল। দুর্বল শরীর নিয়ে নন্দন দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর পোশাক পরল।

পোশাক পরতে পরতেই আকস্মিক টের পেল নন্দন যে, সে আপনমনে কথা বলছে।

প্রিয়নাথ ও তোমারই মেয়ে। তোমারই। তোমারই।

৬

এত নিরাপদ শহর কি কোথাও আছে ?

মধ্যরাতে একা সুন্দরী যুবতী মেয়ে বেরিয়ে এল। বন্ধুর বাড়ি জানা ছিল। আবার বেরিয়ে এসে বড় রাস্তার ফুটপাথ ধরে হাঁটছে, কৈ, কিছু তো হলো না ! কেউ পিছু নিল না, অপহরণের চেষ্টা করল না।

রাস্তায় অবশ্য লোক নেই। কিন্তু একেবারে জনশূন্য তো কলকাতার কোনোও রাস্তাই কখনও হয় না। হাঁটতে হাঁটতে তুধলি এক আধজন গরিব গুবেবোকে দেখতে পায়। ফুটপাথে এক কেশো বুড়ো বসে বিড়ি খাচ্ছে আর কাশছে। একটা তুটো প্রাইভেট গাড়ি তীরের মতো ছুটে চলে গেল। রিকশায় এক মাতালকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে এক রিকশাওয়ালা।

তুধলি অনেকটা হাঁটল। এতক্ষণে কি টের পেয়েছে ওরা যে, তুধলি বাড়িতে নেই ?

অন্তত একজন পেয়েছে। অগ্নিভ। মুখখানা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে যায় নি আতঙ্কে ? তুশ্চিন্তায় ?

তুধলি ভাবতে চায় না অগ্নিভর কথা। সে উল্টোদিকে হাঁটল। কোথাও পৌঁছে যাওয়ার তাড়া নেই। ভারমুক্ত মন।

একটা ট্যাক্সি যেতে যেতে হঠাৎ থামল। একদম পাশে।

একটু চমকে গিয়েছিল ব্রেকের শব্দে তুধলি। চেয়ে দেখল, দরজাটা খুব আস্তে খুলে গেল।

একটা তুর্বল গলার ডাক এল, তুধলি, শোনো !

গলাটা চেনে না তুধলি। কিন্তু কেমন গা শিরশির করল ভয়ে। ওরা তাকে

খুঁজতে বেরিয়েছে নাকি? জানাজানি হয়ে যায় নি তো?

একটা লোক ট্যাক্সি থেকে অর্ধেক নেমে স্থির হয়ে রয়েছে। এগোচ্ছে না। কে লোকটা?

ভুধলি এক পা এগিয়ে গিয়ে বলল, কী বলছেন?

লোকটা মাথাটা ধীরে ধীরে অতি কষ্টে তুলে বলল, আমার শরীরটা ভালো নেই, প্লীজ!

আপনি আমাকে চেনেন?

হ্যাঁ, খুব।

কিন্তু আপনাকে আমি—

চেনবার দরকার নেই। আমি তোমার ওয়েল উইসার।

কী চান?

ফিরে চলো।

আপনার কী হয়েছে?

জানি না। শরীরের কলকব্জা ঠিক নেই। এসো।

আপনার সঙ্গে যাবো কেন?

দেরি করো না ভুধলি। হয়তো অনেক দেরি হয়ে যাবে। কপাল ভালো, হঠাৎ তোমাকে দেখতে পেয়ে গেলাম। নইলে যে কী করতাম। এসো।

মুখটা খুব চেনা লাগতে লাগল ভুধলির। কিন্তু কোথায় দেখেছে? মনে পড়ল না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে টিক টিক করতে লাগল একটা অস্বস্তি।

আসবে না? দয়া করো ভুধলি, বেশী কথা বললে আমার দম ফুরিয়ে যাবে।

ভুধলির মধ্যে এখন আর বিদ্রোহ নেই। তার মনে হচ্ছে, কেলেঙ্কারী আর গড়ালে তার ভীতু বাবা হার্টফেল করবে। মার কী হবে কে জানে! ফের-বার ইচ্ছেটা হঠাৎ জেগে উঠল ভেতরে।

অগ্নিভর সঙ্গে পরে বোঝাপড়া হবে।

ভুধলি ট্যাকসিতে উঠল। লোকটা সরে বসে পেছনে হেলান দিয়ে একটা

সুদীর্ঘ শ্বাস ছেড়ে বলল, আঃ, বাঁচালে।

এই ঘটনার সাত দিন বাদে হঠাৎ এক মেঘলা বৃষ্টির বিকেলে ছুধলি বসে সাজছিল। সামনে আয়না। অগ্নিভ গাড়ি বের করতে গেছে গ্যারাজে। তারা বেরোবে।

কারেন্ট হঠাৎ চলে গেল অসময়ে। মেঘলা ময়লা আলোয় নিজের মুখখানা আয়নায় দেখছিল ছুধলি। হঠাৎ মনে হলো, মুখটা কোথায় দেখেছে। কোথায়?

আচমকাই মনে পড়ে গেল, ট্যাক্সির আধো অন্ধকারে দেখা একজন শীর্ণ মানুষের মুখ। কোথায় দেখেছে মুখখানা?

ছুধলি একটু ঝুঁকল। নিজের মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন উদ্যত হলো তার মনে, কে তুমি?

কিন্তু বাধা পড়লো। অগ্নিভ এসে দাঁড়াল পেছনে, চলো, বৃষ্টি আসছে। চলো।

প্রশ্নটা করা হলো না।

আমাদের প্রকাশিত
লেখকের অন্য বই

কাঁচের মানুষ

ব্যাধ

গোলাপের কাঁটা

ছায়াময়ী